আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ

মাঠ পর্যায়ের সুফলভোগী খামারী প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা

প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারি ২০২০

মাঠ পর্যারের সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

পান্ডুলিপি প্রণয়ন
ফয়সাল মেহেদী হাসান
ডাঃ মোঃ মুহসীন তরফদার রাজু

সম্পাদনায়
মোঃ মাহবুবুর রহমান
ডাঃ মোঃ গোলাম কবীর
ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ হাওলাদার

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও প্রচ্ছদ ডিজাইন
ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ হাওলাদার
প্রকল্প পরিচালক

উপদেষ্টা
ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদার
মহাপরিচালক

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান
ডাঃ মোঃ রিগ্যান মোল্লা, মিথুন চন্দ্র দে, সাইফুল ইসলাম, উজ্জ্বল তালুকদার ও সুমন মজুমদার।

প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি.

প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ঐকান্তিক ইচ্ছায় দেশব্যাপী "আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প" গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদভাবে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে সহায়ক হবে, যা নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করবে। বর্তমানে জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং ৫০ শতাংশ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল।

প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী এর লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নে ২০২৩ সালের মধ্যে গবাদিপশুর উৎপাদন দ্বিগুণ করতে এ প্রকল্প কার্যকর ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশে নিরাপদ গরুর মাংস রপ্তানি শুরু করবে। বর্তমানে খামারীরা বেশ আগ্রহ নিয়ে জেলা/উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের পরামর্শমত গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রাণিজ আমিষের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ২০৩০ এর অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উক্ত প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী এক নববিপ্লবের সূচনা হবে। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি মাঠপর্যায়ের সুফলভোগীদের প্রয়োজনে আসবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এই ম্যানুয়ালটি তৈরীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি)

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বহুমুখী উদ্যোগ ও প্রণোদনার ফলে আজ দেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমান সরকার টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে "আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প" গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিজ্ঞানসম্মত এবং নিরাপদভাবে গরু হৃষ্টপুষ্ট করে দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং খাত **টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ (এসডিজি)** এর অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় প্রাণিসম্পদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রক্রিয়াজাত চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য এবং প্রাণিসম্পদজাত বুলিস্টিক, ওমেজাম, এবোমেজাম, ইনটেস্টাইন এবং গরুর সিং রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রাণিসম্পদ খাত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনায় আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার ভিশন বাস্তবায়নকল্পে মৎস্য ও প্রাণিসসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ ম্যানুয়ালে বিজ্ঞানভিত্তিক গরু লালন-পালন, সুষম খাবার ব্যবস্থাপনা এবং রোগ প্রতিরোধকল্পে নিয়মিত টিকা প্রদান বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে, যা মাঠ পর্যায়ের প্রান্তিক খামারীসহ প্রাণিসম্পদ সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রয়োজনে আসবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(রওনক মাহমুদ)

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৪৭ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৩.৪৬ শতাংশ। জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং ৫০ শতাংশ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশ সম্প্রতি মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন টেকসই করার নিমিত্তে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম চালু করেছে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ দেশীয় গবাদিপশু দ্বারা কোরবানির গবাদিপশুর চাহিদা পূরণ করে আসছে। বর্তমানে খামারীরা বেশ আগ্রহ নিয়ে প্রাণিসম্পদ দপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের পরামর্শ মতো গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমকে বেগবান করতে “আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প” এর আওতায় সারা দেশে সুফলভোগী খামারী নির্বাচনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। গবাদিপশুর জাত নির্বাচন, পুষ্টি ব্যবস্থাপনা এবং গরু হৃষ্টপুষ্ট করতে প্রয়োজনীয় বিষয় ও গুরুত্ব বিবেচনা করে ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের জন্য প্রণীত এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও সময় উপযোগী হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি মাঠপর্যায়ের সুফলভোগীদের উপকারে আসবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই ম্যানুয়ালটি তৈরীতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। পরম স্রষ্টার নিকট সবারজন্য কল্যাণ ও শুভ কামনা।

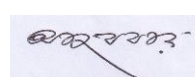

(ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদার)

পরিচালক, উৎপাদন
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
ও
সভাপতি
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন কমিটি
আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প।

বাণী

বাংলাদেশ আজ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট মাংস উৎপাদন হয়েছে ৭৫.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন যা জনপ্রতি প্রাপ্যতা ১২৪.৯৯ গ্রাম/দিন। দেশে উৎপাদিত গবাদিপশু দ্বারা প্রতিবছর কোরবানীর চাহিদা পূরণ হচ্ছে। সেই উৎপাদন টেকসই করার নিমিত্তে সম্প্রতি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর "আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প"- এর কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে সুফলভোগী নির্বাচনের মাধ্যমে ৩দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। সেই লক্ষ্যে সুফলভোগী খামারীদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে গবাদিপশুর জাত, সুষম ব্যবস্থাপনা যেমন বাসস্থান নির্মাণ, সুষম খাদ্য, ইউরিয়া মোলাসেস খড় তৈরি, সাইলেজ সহ সময়মতো কৃমিনাশক ঔষুধ সেবন ও টিকা প্রয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

মডিউলটি প্রণয়নে মেধা, মনন ও শ্রম প্রদানের জন্য প্রকল্পের পরিচালক সহ অন্যান্য যারা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন সকলকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

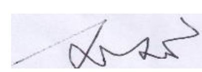

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)

প্রকল্প পরিচালক
আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

মুখবন্ধ

দেশের প্রায় ৫০ ভাগ লোক গবাদিপশু পালনের সাথে জড়িত থাকলেও খুবই কম সংখ্যক খামারীর গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা আছে। গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ না থাকায় অনেকে সনাতন পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্ট করছে যার ফলে খামারীরা যেমন কাঙ্খিত মাত্রায় লাভবান হচ্ছে না তেমনি গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দিচ্ছে।

বর্তমানে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ একটি লাভজনক উদ্যোগ। বেসরকারি পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ করা হয়ে থাকে। দেশের সর্বত্র গবাদিপশু পালনের সাথে জড়িত খামারীদেরকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ সম্পর্কে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সম্প্রতি "আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প" গ্রহণ করেছে। সঠিকভাবে বাছাই করা গরুকে সুষম খাদ্য প্রদান করে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য বিধি অনুযায়ী উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে অল্প সময়ে মাংস বৃদ্ধি করাই হলো গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ।

সরকারি পর্যায়ে দেশের সর্বত্র সুফলভোগী খামারী নির্বাচন করার মাধ্যমে ৩দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি তৈরি করা হয়েছে। সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে বিদ্যমান নিরাপদ মাংসের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদেশে মাংস রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ প্রসারিত হবে। এছাড়া কোরবানির সময় পর্যাপ্ত সুস্থ সবল গরুর সরবরাহ নিশ্চিত হবে।

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি সুফলভোগী খামারী, প্রশিক্ষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন, সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

(ডা. প্রাণকৃষ্ণ হাওলাদার)

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	**ভূমিকা**	৯
২.	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১০-১৬
৩.	গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের সুবিধা সমূহ	১৬
৪.	হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য গরুর বৈশিষ্ট্য ও চেনার উপায়	১৬
৫.	হৃষ্টপুষ্টকরণেরজন্য গরু ক্রয় বা সংগ্রহ পরবর্তী করণীয়	১৭
৬.	মাংস উৎপাদনশীল গরুর জাত পরিচিতি	১৭-২৩
৭.	বাসস্থান নির্বাচন	২৩-২৪
৮.	গোয়াল ঘর নির্মাণ ও গরু প্রতি জায়গার পরিমাণ	২৫
৯.	বাসস্থানের স্বাস্থ্য সম্মত দৈনন্দিন পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা	২৫-২৬
১০.	গো-খাদ্য হিসাবে সবুজ ঘাস, দানাদার খাদ্য ও শুকনো খড়ের পাচ্যতা	২৬
১১.	গো-খাদ্যে ইউরিয়া ব্যবহারে উপকারিতা	২৬
১২.	গো-খাদ্যে ইউরিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা	২৭
১৩.	গবাদিপশু ইউরিয়া বিষক্রিয়ার লক্ষণ	২৭
১৪.	গবাদিপশুতে ইউরিয়া বিষক্রিয়ায় করণীয়	২৭
১৫.	গো-খাদ্য সংরক্ষণ	২৮-৩০
১৬.	উন্নত জাতের ও হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ	৩১-৩৬
১৭.	গরুর সুষম খাদ্য ও খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা	৩৭
১৮.	গো-খাদ্যে পুষ্টি ব্যবস্থাপনা	৩৮-৩৯
১৯.	শুকনো খড়ের সাথে ইউরিয়া খাওয়ানোর কৌশল	৪০
২০.	দানাদার খাদ্যের সাথে ইউরিয়া খাওয়ানোর কৌশল	৪১
২১.	গরুর জন্য সবুজ ঘাসের বিকল্প হিসেবে এ্যালজির (শেওলা) ব্যবহার ও সাবধানতা	৪২
২২.	গবাদিপশুর রোগ পরিচিতি, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা	৪৩-৫২
২৩.	গবাদি পশুর রোগ প্রতিরোধে টিকার ব্যবহার ও সতর্কতা	৫৩-৫৫
২৪.	এক নজরে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রক্রিয়া	৫৬
২৫.	গরুর ওজন নির্ণয়	৫৭
২৬.	গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য (১০টি গরুর) বিভিন্ন ব্যয়, আয় ও নীট মুনাফা সংক্রান্ত খসড়া হিসাব বিবরণী	৫৮
২৭.	হেলথ কার্ড এর নমুনা	৫৯-৬০

ভূমিকা

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূচিত পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৪৭% এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.৪৭%। মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৩.৪৬%। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষ ভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল। প্রাণিসম্পদ কৃষকের কর্মসংস্থান, নগদ আয়, পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদার উৎস। বর্তমানে দুধ, মাংস ও ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে যথাক্রমে ১৬৫.০৭ মিলি/দিন, ১২৪.৯৯ গ্রাম/দিন এবং ১০৩.৮৯টি/বছর এ উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে দেশে নিরাপদ মাংসের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে প্রতি বছর ঈদ-উল-আযহার সময় জনগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য গবাদিপশু কোরবানী করে থাকে। কোরবানির পশু ক্রয় বিক্রয়ের জন্য সারাদেশ জুড়ে স্থায়ী হাট-বাজারের পাশাপাশি অস্থায়ী হাট-বাজার গড়ে উঠে। লাভজনক বাজারকে লক্ষ্য করে গবাদিপশু পালনকারীগণ ও ব্যবসায়ীগণ গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণ কাজে সম্পৃক্ত থাকেন। এ বছর ঈদ-উল-আযহায় মোট কোরবানী যোগ্য গবাদিপশুর সংখ্যা ১ কোটি ১৮ লাখ। নিষিদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্য স্টেরয়েড, হরমোন, এন্টিবায়োটিক ব্যতীত নিরাপদ পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আধুনিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সঠিকভাবে বাছাই করা গরুকে সুষম খাদ্য প্রদান করে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে অল্প সময়ে মাংস বৃদ্ধি করাই হল গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ। সুতরাং এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফলে একদিকে যেমন দেশে বিদ্যমান নিরাপদ মাংসের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে মাংসের বাজার স্থিতিশীল থাকবে এবং কোরবানির সময় পর্যাপ্ত গরুর সরবরাহ নিশ্চিত হবে অন্য দিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া চামড়া ও উদ্বৃত্ত মাংস রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১। মেধা সম্পন্ন জাতি গঠনের লক্ষ্যে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ নিশ্চিত এবং ক্রমাগত বৃদ্ধিকরণ;
২। মাংস ও চামড়া রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;
৩। প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন পদ্ধতি নিরাপদকরণ;
৪। ঈদ-উল-আযহা এর সময় হাটে পর্যাপ্ত গরুর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
৫। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন;
৬। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে গ্রামীন উন্নয়ন ও শিল্পায়নে সহায়তা করা;
৭। জৈব সার সহজলভ্য করা;
৮। পরিবেশ দূষণমুক্ত ও গবাদিপশুজাত শিল্প গড়ে তোলা;
৯। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ;
১০। কর্মসূচী সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এ কাজে উৎসাহিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

প্রকল্পের আউটপুট

- ৪৯১ টি উপজেলার ১১০৪৭৫ খামারী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রশিক্ষণ;
- সুফলভোগীদের মাঝে বিনা মূল্যে ভ্যাকসিন ও কৃমিনাশক ওষুধ বিতরণ;
- গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ বিষয়ক প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সচেতনতা বৃদ্ধি;

প্রকল্পের কার্যাবলী

(ক) সুফলভোগী খামারীদের সংখ্যা নির্ধারণ

প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রম সকল এলাকায় সমানভাবে বিস্তৃত না করে, যেসব এলাকায় বেশি গরু হৃষ্টপুষ্ট করা হয়ে থাকে সেসব এলাকাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দেশে গরু হৃষ্টপুষ্ট করণের সাথে জড়িত যেসব খামারী সংখ্যা এবং বিভাগ ভিত্তিক রয়েছে সেসব খামারীদের সংখ্যা ও বিভাগ নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হল -

বিভাগ ভিত্তিক গরু হৃষ্টপুষ্টকণের সাথে জড়িত খামারীদের সংখ্যা ঃ

বিভাগের নাম	খামারীর সংখ্যা
রাজশাহী	১০৩০৬৬
ঢাকা	৭৫৮৭০
খুলনা	৬২৪৪০
রংপুর	৫৪০২১
সিলেট	৫২৯১০
চট্রগ্রাম	৪১৬৫০
ময়মনসিংহ	৩৯৮৮৩
বরিশাল	১৩১৫১
মোট	৪৪২৯৯১

সূত্র : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (খামার শাখা) - জুন, ২০১৮

দেশের ৮টি বিভাগের মধ্যে রাজশাহী বিভাগে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের সাথে জড়িত খামারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সুতরাং রাজশাহী বিভাগের প্রতিটি উপজেলায় প্রতি বছর ৫ ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ২৫জন) ১২৫ জন, অনুরুপভাবে ঢাকা বিভাগের প্রতিটি উপজেলায় প্রতি বছর ৪ ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ২৫ জন) ১০০ জন সুফলভোগী নির্বাচন করা হবে। খুলনা, সিলেট এবং রংপুর বিভাগের প্রতিটি উপজেলায় প্রতি বছর ৩ ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ২৫ জন) ৭৫ জন সুফলভোগী নির্বাচন করা হবে। এছাড়া চট্রগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগের প্রতিটি উপজেলায় প্রতি বছর ২ ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ২৫ জন) ৫০ জন এবং বরিশাল বিভাগের প্রতিটি উপজেলায় প্রতি বছর ১ ব্যাচে ২৫ জন সুফলভোগী খামারী নির্বাচন করা হবে। এভাবে ৩ বছরে ৪৯১ টি উপজেলা থেকে মোট ১১০৪৭৫ জন সুফলভোগী খামারী নির্বাচন করা হবে।

(খ) সুফলভোগী খামারী নির্বাচন পদ্ধতি এবং উপকরণ বিতরনের শর্ত

সংশ্লিষ্ট উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে সুফলভোগী নির্বাচন করা হবে, যাদের কমপক্ষে ২ টি বাড়ন্ত এঁড়ে / ষাঁড় বাছুর থাকবে অথবা পালন করার সামর্থ আছে। এছাড়া যারা গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আগ্রহী তারা নিজ নিজ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট নির্বাচিত সুফলভোগীর মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও নির্বাচিত গরুর সংখ্যা এবং সঠিক তথ্য দিয়ে প্রকল্প পরিচালকের অফিসে প্রেরণ করবেন। প্রত্যেক সুফলভোগীকে পার্শ্ববর্তী কমপক্ষে ১০ জন খামারীকে আধুনিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ শর্তে প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ বিতরণ করা হবে।

(গ) হেলথ কার্ড

প্রকল্প পরিচালক সুফলভোগীদের হেলথ কার্ড প্রদান করবেন। হেলথ কার্ডে সুফলভোগীর পূর্ণ নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বর সহ উপকরণ সরবরাহের তারিখ এছাড়াও প্রথম দিন থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত নির্বাচিত গরুর দৈহিক ওজন, এবং সুফলভোগী খামারীর স্বাক্ষরের ঘর থাকবে। এই প্রকল্পে গরুর ওজন নিয়মিত রেকর্ড করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথমে ক্রয়কৃত গরুর ওজন রেকর্ড করতে হবে এবং ১৫ দিন পর পর প্রতিটি গরুর ওজন এবং খাবার সরবরাহের সাথে দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা তার তথ্য নিবন্ধন কার্ডে রেবর্ড করতে হবে। এছাড়াও গরুর শারীরিক বৃদ্ধির হার হিসাব করে দেখতে হবে যে প্রতিদিন কত গ্রাম বা কত কেজি ওজন বৃদ্ধি হচ্ছে, তাতে পালনের অগ্রগতি বুঝা যায়। প্রকল্প পরিচালক এই হেলথ নিবন্ধন কার্ডটি প্রত্যেক উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কাছে পাঠাবেন এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তারা সুফলভোগীদের মাঝে এ কার্ডটি বিতরণ করবেন। সুফলভোগীরা সকল তথ্য কার্ডে লিপিবদ্ধ করবে। গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্পের কাজটি শেষ হওয়ার পর যাবতীয় তথ্যাদি সম্বলিত হেলথ কার্ডটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা দপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা হবে। এতে সারা বৎসর মাংস উৎপাদনের একটি আনুমানিক চিত্র পাওয়া যাবে।

(ঘ) সুফলভোগী খামারীর প্রশিক্ষণ

বৈজ্ঞানিক উপায়ে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ খামার গড়ার জন্য প্রথমে দরকার মানসিক প্রস্তুতি এবং খামারের প্রস্তুতি। গরুর বাসস্থান তৈরী ও ব্যবস্থাপনা, গরু নির্বাচন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, বায়োসিকিউরিটি, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারনা বা জ্ঞান না থাকলে গরু হৃষ্টপুষ্ট করে লাভবান হওয়া সম্ভব নয়। তাই গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য প্রশিক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে সুফলভোগীদের জন্য ৫ দিন করে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুপারিশ থাকলেও গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ৩ দিনে সম্পন্ন করা সম্ভব বিধায় প্রকল্পে সুফলভোগীদের জন্য ৩ দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২৫ জন সুফলভোগীকে নিয়ে একটি ব্যাচ করে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে ৩ দিন করে গবাদিপশুর বাসস্থান, যন্ত্রাদি ও প্রাথমিক চিকিৎসা, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, হৃষ্টপুষ্টকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি, সাইলেজ প্রস্তুত করণ, খড় সংরক্ষণ পদ্ধতি, উন্নত ঘাস চাষ ও গরুর শারীরিক ওজন নির্ণয় পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০% নারী সুফলভোগী নির্বাচন করা হবে।

(ঙ) কৃমিনাশক ঔষধ, ভ্যাকসিন সরবরাহ

কৃমিনাশক ঔষধ ও ভ্যাকসিন প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করে সুফলভোগীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরন করা হবে। এতে খামারীরা খুব সহজে কৃমিনাশক ঔষধ ও ভ্যাকসিন পাবে এবং খামারীরা তাদের গরুর চিকিৎসা করতে পারবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খামারীদের গরুর কৃমিনাশক রোগ এবং অন্যান্য রোগ খুব সহজে কমে যাবে।

কৃমিনাশক ঔষধ, ভ্যাকসিন, ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স সরবরাহের তালিকা ঃ

ক্র:নং	ইনপুট সরবরাহের নাম	মাত্রা	ইনপুট সরবরাহের সময়
১.	ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র	প্রাণির ওজন অনুযায়ী	কার্যক্রম শুরুর ১ম দিন থেকে বিক্রির পূর্ব পর্যন্ত
২.	কৃমিনাশক ঔষধ (ট্রাইক্লাবেন্ডাজল ৯০০ মি.গ্রা.+ লিভাজল ৬০০ মি.গ্রা. বোলাস)	২ টি বোলাস/প্রাণি	কার্যক্রম শুরুর ৩ দিনের মধ্যে
৩.	বাদলা টিকা	৫ মিলি/প্রাণি	কার্যক্রম শুরুর ৮ম দিন
৪	ক্ষুরারোগের টিকা	২ মিলি/প্রাণি	কার্যক্রম শুরুর ১০ম ও ৩০তম দিন
৫	তড়কা টিকা	১ মিলি/প্রাণি	কার্যক্রম শুরুর ১৫তম দিন
৬	এইচ.এস. টিকা	২ মিলি/প্রাণি	কার্যক্রম শুরুর ২০তম দিন

(চ) ইউরিয়া ও মোলাসেস মিশ্রিত খড় (ইউএমএস) পদ্ধতির পাশাপাশি গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে অন্যান্য পযুক্তিসমূহ ঃ

পদ্ধতি	খাদ্য	শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে গঠন	খাদ্যের ওজনের ভিত্তিতে গঠন
ইউএমএস	খড়: চিটাগুড়: ইউরিয়া	৮২ঃ১৫ঃ৩	১০০ঃ২২-৩০ঃ৩
সংরক্ষিত	খড়: ইউরিয়া	১০০ঃ৪	১০০ঃ২.০
তাজা ও ভেজা খড়	খড়: চিটাগুড়	৯০ঃ১০	১০০ঃ৩-৫
সবুচ ঘাস	সবুজ ঘাস: চিটাগুড়	১০০ঃ১০	১০০ঃ৩.০-৩.৫

সূত্র: প্রাণিসম্পদ ও পোলটি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

(ছ) ইউরিয়া মোলাসেস খড় (ইউ.এম.এস) খাওয়ানোর গবেষণালব্ধ ফল (গরুর দৈহিক ওজন বৃদ্ধি)

বিএলআরআই গবেষণায় দেখা গেছে বাড়ন্ত ষাঁড়কে (৩০০ কিলো) ইউ.এম.এস খাওয়ানোর সাথে দৈহিক ওজনের শতকরা ০.০৮-১.০ ভাগ দানাদার মিশ্রন সরবারহ করলে দৈনিক ৭০০ থেকে ৯০০ গ্রাম দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পায়।

(জ) ডাটাবেজ প্রণয়ন

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট থেকে প্রশিক্ষণের একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আত্ততায় প্রশিক্ষণার্থিদের সকল তথ্য উক্ত ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। যাতে করে সকল খামারীরা সঠিক ভাবে প্রশিক্ষণ পেতে পারে এবং প্রকল্পের কাজ ও সঠিক ভাবে সম্পন্ন করা যাবে।

(ঝ) জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ

আধুনিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা, উপজেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা, ভিডিও চিত্র নির্মাণ এবং প্রচারের জন্য আলোচ্য বিষয় গুলো প্রকল্পের সংস্থানে রাখা হয়েছে। এতে করে প্রকল্পের বৃদ্ধি মাত্রা কতোটুকু অগ্রতি হচ্ছে তা বুঝা যাবে।

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের সুবিধা সমূহ

১। কম মূলধন ও কম জায়গার প্রয়োজন হয়।

২। অল্প সময়ের (৪-৬ মাসের) মধ্যে গরু হৃষ্টপুষ্ট করে অধিক মূল্যে বাজারে বিক্রয় করা যায় অর্থাৎ আর্থিক মুনাফা অর্জন করা যায়।

৩। খুব সল্প সময়ের মধ্যে লাভসহ মুনাফা ফেরত পাওয়া যায়।

৪। বেকার এবং নারীর কর্মসংস্থানে সুযোগ বেশি।

৫। বসতভিটা আছে এমন সকল পরিবার স্বল্প বিনিয়োগকরে এ প্রকল্পের আওতায় আসার ব্যাপক সুযোগ লাভ করতে পারে।

৬। বাজারের মাংসের চাহিদা সব সময় বেশি থাকার কারণে বাজার দর নিম্নগতির সম্ভাবনা কম ও লোকসানের ঝুঁকি কম থাকে।

৭। বাড়ন্ত গরুর রোগ-ব্যাধির প্রকোপ খুব কম থাকে, ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনাখুব কম।

৮। স্থানীয় বাজার-হাট থেকে অনায়াসে পশু ক্রয় করে প্রকল্প শুরু করা যায়।

৯। স্থানীয় ভাবে খাদ্যের সাথে বাড়ির উচ্ছিষ্ঠ্য খাদ্যের সদ্ব্যাবহার হয়।

হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য গরুর বৈশিষ্ট্য ও চেনার উপায়

- সঠিক গরু নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
- অধিক মাংস উৎপাদন বা দৈনন্দিন ওজন বৃদ্ধির কৌলিক গুণাগুণ সমৃদ্ধ জাতের গরু পাওয়া সম্ভব।
- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী খামারীদের সংকর জাতের গরু নির্বাচন করা উত্তম।
- গরুর বয়সের দিকটা বিবেচনা করতে হবে এবং ২-৩ বছরের ষাঁড় গরু নির্বাচন করতে হবে।
- গরুর দেহ লম্বা, পা খাটো, মাথা মোটা, চামড়া মসৃণ ও ঢিলেঢালা এবং সংক্রামক রোগ মুক্ত হতে হবে।

হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য গরু ক্রয় বা সংগ্রহ পরবর্তী করণীয়

- ক্রয় বা সংগ্রহের পর ৭ দিন পৃথকভাবে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে গরু রোগাক্রান্ত কি না।
- গরুর গোবর পরীক্ষা করে কৃমি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শে কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে।
- ক্ষুরা, তড়কা, বাদলা এবং গলাফুলা রোগের টীকা যদি দেয়া না থাকে তাহলে প্রতিষেধক টীকা দিতে হবে।
- মোটাতাজা করার জন্য পর্যাপ্ত সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- প্রয়োজনে মাল্টিভিটামিন খাওয়ানো যেতে পারে।
- রোগের লক্ষণ দেখামাত্র ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে।
- সঠিক সময়ে বাজারজাত করতে হবে।

মাংস উৎপাদনশীল গরুর জাত পরিচিতি

১. দেশী গরু (Local variety)

- দেশী জাতের গরু মূলত পরিশ্রমী জাত। বলদ কৃষি কাজ ও ভারবহনের কাজে বেশ উপযোগী।
- বাংলাদেশের অধিকাংশ গরুই দেশী জাতের। এরা আকারে ছোট, একটি পূর্ণ বয়স্ক দেশী গরুর ওজন গড়ে ১৫০ কেজি হয়।
- দেশী জাতের গাভী গড়ে ১-৩ লিটার দুধ দেয় কিন্তু দেশী জাতের ষাঁড় গরুর মাংস বেশ সুস্বাদু।

চিত্রঃ বাংলাদেশী দেশীয় গরু

২. পাবনা জেলার গরু (Pabna variety)

- দ্বৈত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাত। গাভী ও বলদ উভয়েই আকারে বেশ উঁচু ও লম্বা হয়।
- দেহের রং গাঢ় ধূসর হতে সাদা ছাপযুক্ত হয়ে থাকে।
- একটি গাভী প্রতিদিন ৬-১০ কেজি দুধ দেয়।
- এ জাতের বলদ দেশীয় সাধারণ জাত হতে অনেক বেশী পরিশ্রমী এবং কৃষি কাজে বেশ উপযুক্ত।

চিত্রঃ পাবনা জাতের গরু

৩. ফরিদপুর জেলার গরু (Faridpur variety)

- বাংলাদেশের মধ্যে ফরিদপুরের গরু বেশ উন্নত ধরনের। মূলত দ্বৈত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাত।
- হরিয়ানা জাতের ক্রস ফরিদপুর জেলায় যথেষ্ট দেখা যায়।
- এদের রং সাদা, চামড়া পাতলা এবং এরা মাথা উঁচু করে হাঁটে।
- ষাঁড়ের ওজন ২৫০-৩০০ কেজি এবং গাভীর ওজন ২০০-৩০০ কেজি পর্যন্ত হয়।

৪. ঢাকা মুন্সিগঞ্জ এলাকার গরু (Munshiganj variety)

- গরুর আকৃতি মধ্যম, একটু লম্বাটে ধরনের বিভিন্ন বর্ণের হয়। মূলত দ্বৈত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাত।
- মুখ কিছুটা সুরু ও লম্বা। গাভীর চূড়া প্রায় থাকে না। পিঠ সোজা, শিং সুরু ও খুব ধারালো।
- দেহের সাথে আটসাঁট ওলান সম্মুখের দিকে একটু বাঁকানো। মিল্ক ভেইন মোটা ও স্পষ্ট। দৈনিক ১০-১২ লিটার দুধ দেয়।
- ষাঁড় ও বলদ বেশ বড় ও কর্মঠ। গাড়ী টানা ও চাষের বেশ উপযুক্ত।

৫. চট্টগ্রামের লাল গরু (Chittagong red variety)

- মূলত দ্বৈত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাত। হালকা লাল বর্ণের এ জাতের গরু দেখতে ছোট খাটো পিছনের দিক বেশ ভারী, চামড়া পাতলা, শিং ছোট ও চ্যাপ্টা।
- মুখ খাটো ও চওড়া, লেজ যথেষ্ট লম্বা এবং শেষ প্রান্তে চুলের গুচ্ছ লাল বর্ণের।
- ওলান বেশ বর্ধিত, বাঁট সুডৌল, মিল্ক ভেইন স্পষ্ট, দৈনিক ১০-১২ লিটার দুধ দেয়।
- ষাঁড় ও বলদ বলিষ্ট ও শক্তিশালী। কৃষি ও ভার বহনের কাজে উপযোগী।

চিত্রঃ চট্টগ্রামের লাল জাতের গরু

৬. শাহিওয়াল গরু (Shahiwal variety)

- এ জাতের গরু ধীর ও শান্ত প্রকৃতির, মোটাসোটা ভারী দেহ, ত্বক পাতলা ও শিথিল।
- এজাতের গাভীর শিং ছোট, মাথা চওড়া। ষাঁড়ের চূড়া অত্যধিক বড়।
- গলকম্বল বৃহদাকার যা ঝুলে থাকে, লেজ বেশ লম্বা, প্রায় মাটি ছুঁয়ে যায়, লেজের আগায় দর্শনীয় একগোছা কালো লোম থাকে।
- গাভীর ওলান বড়, চওড়া, নরম ও মেদহীন, বাটগুলো লম্বা, মোটা ও সমান আকৃতি বিশিষ্ট।
- ষাঁড়ের দৈহিক ওজন ৫০০ -৫২০ কেজি এবং গাভীর ২৫০ - ৪০০ কেজি পর্যন্ত হয়।

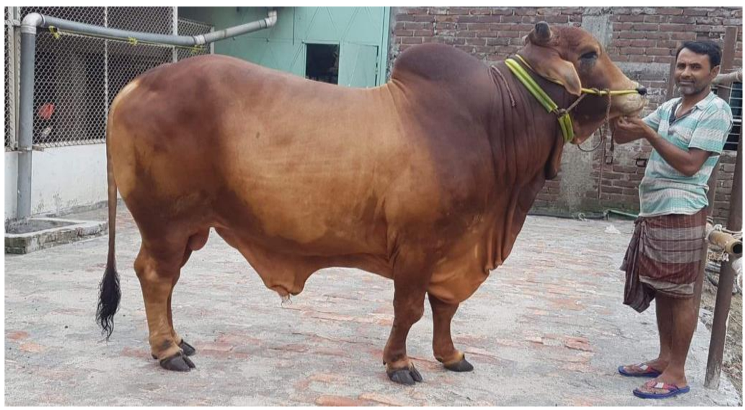

চিত্রঃ শাহিওয়াল জাতের গরু

৭. সিন্ধি গরু (Sindhi variety)

- পাকিস্তানের সিন্ধু এলাকায় এ জাতের গরুর আদি বাসস্থান। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে এ জাতটি বেশ পালিত হয়।
- সাধারণত গাঢ় লাল ও চকলেট বর্ণের হয়ে থাকে। গাভী অপেক্ষা ষাঁড়ের রং বেশী গাঢ় হয়।
- আকৃতি মাঝারি, সুডৌল, বলিষ্ট ও দেহ আটসাঁট। গাভীকে শান্তশিষ্ট ও বুদ্ধিদীপ্ত দেখায়।
- ভোঁতা শিং যা পাশে ও পিছনে বাঁকানো থাকে। মাথা ও মুখ মন্ডল ছোট। চওড়া কপাল, কপালের মাঝের অংশ কিছুটা উঁচু।
- ষাঁড়ের চূড়া বেশ উঁচু, গলকম্বল বৃহদাকার ও ভাঁজযুক্ত। নাভি চর্ম বড় ও ঝুলন্ত। ষাঁড়ের ওজন প্রায় ৪৫০ কেজি।

চিত্রঃ সিন্ধি জাতের গরু

৮. জার্সি (Jersey)

- প্রায় ৫০০ বছর ধরে ইংলিশ চ্যানেলের জার্সি দ্বীপে জার্সি জাতের গরুর প্রজনন হয়ে আসছে। পরিকল্পিত প্রজননের ফলে জার্সি প্রসিদ্ধ দুধাল জাত হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।
- লম্বা দেহ, খাটো পা এবং চূড়া হতে কোমর পর্যন্ত পিঠ একদম সোজা থাকে।
- বিভিন্ন রংয়ের হয়, তবে প্রধানত হালকা লালচে বাদামী রং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।
- জোড়া শিং যুক্ত চওড়া কপাল। শিং পাতলা ও সামনের দিকে কিছুটা বাঁকানো থাকে।
- মুখবন্ধনী বা মাজেল কালো ও চকচকে হয়।
- জার্সি জাতের গাভী বাংলাদেশের আবহাওয়ায় পালনের উপযোগী।

চিত্রঃ জার্সি জাতের গরু

৯. হলস্টিন (Halstein)

- হলস্টিন গরুর উৎপত্তি হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ড। এ জাতের গরুকে পূর্বে হলস্টিন-ফ্রিজিয়ান বলা হত। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বেও অন্যান্য দেশে এজাতের গরু দুধাল জাত হিসেবে পালন করা হয়।
- হলস্টিন গরুর বর্ণ ছোট বড় কালো সাদা ছাপযুক্ত। তবে পায়ের নিম্নাংশ (হাঁটুর নিচে) সাধারণত সাদা হয়।
- এ জাতের গরুর মাথা লম্বাটে ও সোজা হয়। চওড়া মাজেল ও খোলা নস্ট্রিল থাকে।
- এ জাতের গাভীর ওজন প্রায় ৭৫০ কেজি এবং ষাঁড়ের ওজন প্রায় ১০০০ কেজি হয়ে থাকে।

চিত্রঃ হলস্টিন জাতের গরু

১০. ব্রাহমা জাত (Brahman)

- ব্রাহমা জাতের গরুর উৎপত্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ টেক্সাসে ও মেক্সিকো উপকূল এলাকায়।
- এ জাতের গরুর কূঁজ বড়, গলকম্বল ঝুলন্ত, মাংসল দেহ, উন্নত কপাল ও শিং রয়েছে। গায়ের রং হালকা থেকে গাঢ় ধূসর হবে, ষাঁড়ের কূঁজ ও গ্রীবাদেশ কালচে ধূসর হয়ে থাকে।
- জন্মের সময় বাছুরের ওজন ২৬-২৮ কেজি। ষাঁড়ের ওজন প্রায় ৮০০-৯০০ কেজি হয়ে থাকে।

চিত্রঃ ব্রাহমা জাতের গরু

১১. সংকর জাত (Cross bred)

দেশী জাতের গাভীর সাথে বিদেশী জাতের ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সংকর জাতের গরু উৎপাদন করা হয়। আমাদের দেশে প্রধানত হলস্টিন, জার্সি, শাহিওয়াল, সিন্ধি জাতের ষাঁড়ের সিমেন কৃত্রিম প্রজননে প্রয়োগ করে সংকর জাতের গরু উৎপাদন করা হয়। সংকর জাতের গরুর বৈশিষ্ট্য তার পিতামাতার জাত দ্বয়ের সংমিশ্রণে হয়ে থাকে। তাই সংকর জাতের গরু দেশী অপেক্ষা আকারে বড় হয় এবং বেশী দুধ দেয়। একটি পূর্ণ বয়স্ক জাতের গাভীর ওজন ২০০-৩০০ কেজি হয়ে থাকে এবং ষাঁড়ের ওজন ৫০০-৭০০ কেজি হয়ে থাকে। বিদেশী উন্নত জাতের গরুর অনেক সময় আমাদের আবহাওয়ায় পালনের উপযোগী হয় না। কিন্তু সংকর জাতের গরু পালন আমাদের দেশের জন্য বেশী উপযোগী, তাই গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে সংকর জাতের গরুর প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে।

গবাদিপশুর বাসস্থান নির্বাচন

গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণে বাসস্থান কেমন হবে? বাসস্থান নির্ভর করে আপনি কতটি গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে ব্যবহার করবেন। যদি সংখ্যা ১০-১৫টির মধ্যে থাকে, তবে স্ট্রাকচারড শেড বানানোর দরকার নেই। সাধারণত আমরা গোয়ালঘরে যেভাবে গরু পালন করি সেই রকম একটা গোয়ালঘরের মতো ঘর বানাতে পারলেই হৃষ্টপুষ্টকরণ শুরু করা যায়। তবে এখানে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে যে প্রতিটি গরুর জন্য ৩ ফিট প্রস্থ এবং ৭ ফিট দৈর্ঘ্যরে জায়গা দরকার হয়। প্রতিটি গরুর জন্য একটি চারি গোয়ালঘরে রাখতে হবে। খর, টিন, ছন অথবা হোগলাপাতা দিয়ে তৈরি করা যায়। যেখানে যা সহজলভ্য এবং যা সাধ্যের মধ্যে কুলায় এমন উপকরণ দিয়ে হৃষ্টপুষ্টকরণ শুরু করতে হবে। কারণ গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণ একটি লাভজনক ব্যবসা। বাসস্থানের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় মাথায় রাখা দরকার। যেমন গোয়ালঘর খোলামেলা হওয়া ভালো। এতে গবাদিপশুর স্বাস্থ্য ভালো থাকে। গোয়াল ঘরের কাছে একটি স্যালো টিউবওয়েল অথবা ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা দরকার কারণ হৃষ্টপুষ্টকরণে গবাদিপশুকে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি পান করাতে হয়। এছাড়া দানাদার খাবার মিশ্রণ, ইউরিয়া মিশ্রিত স্ট্র এসব প্রস্তুত করতে পর্যাপ্ত পানির সংস্থান থাকতে হয়। তাছাড়া হৃষ্টপুষ্টকরণের পশুকে দু-তিন দিন পরপর পানির স্প্রে করে শরীর ধুইয়ে দিলে ত্বক মসৃণ হয়। বাসস্থানে গোবর এবং মূত্র নিষ্কাশিত হওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য গবাদিপশুর বাসস্থান নির্বাচনের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে:

- লাভজনক খামার স্থাপনের জন্য উপযুক্ত ও সুসংগঠিত বাসস্থানের অবস্থান হবে লোকালয় থেকে দূরে।
- ঘর থাকলেও পারিবারিকভাবে গরু পালনের জন্য অন্যান্য ঘর থেকে কিছুটা দূরে গোয়াল ঘর নির্মাণ করা উচিত।
- বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিরাপত্তা, সুষ্ঠু পরিচর্যা, আরামপ্রদ আবাসানের জন্য সঠিক বাসস্থান প্রয়োজন।
- ঘরের স্থান উঁচু, স্যাঁতস্যাঁতে নয়, প্রচুর আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে এমন হওয়া উচিত।
- বৃষ্টির পানি দ্রুত নেমে যাবে এবং জলাবদ্ধতা তৈরী হবে না এমন জায়গায় বাসস্থান নির্মাণ করতে হবে।

চিত্রঃ গবাদিপশুর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাসস্থান

গোয়াল ঘর নির্মাণ ও গরুপ্রতি জায়গার পরিমান

- গবাদিপশুর জন্য দুই ধরনের ঘর নির্মাণ করা যায়। যথা উন্মুক্ত ঘর / প্রচলিত ঘর।
- বেষ্টনীর ভিতরে গরু ছাড়া অবস্থায় থাকে এবং স্বাধীনভাবে চলাফেলা করতে পারে, এক্ষেত্রে গরুর প্রতি গড়ে ৮০-১০০ বর্গফুট জাযগার প্রয়োজন পড়ে।
- আবদ্ধ ঘরে গরুকে বেঁধে রেখে পালন করা হয়। অল্প সংখ্যক গরুর এক সারি ঘরের জন্য ১৪-১৫ ফুট চওড়া এবং বেশী সংখ্যক গরুর ২ সারি ঘরের জন্য ২৪-২৫ ফুট চওড়া জায়গা প্রয়োজন।
- দোচালা ঘরের মধ্যবর্তী উভয় চালের শীর্ষ পর্যন্ত উচ্চতা ১৪-১৫ ফুট এবং চালের ঢালু অংশের উচ্চতা হবে ৮ ফুট।
- ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

চিত্রঃ উন্মুক্ত গোয়াল ঘর

বাসস্থানের স্বাস্থ্য সম্মত দৈনন্দিন পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা

- গরু ঘর থেকে বের করে নিয়ে এক বা একাধিক বার গোবর, চেনা, খাদ্যের বর্জিতাংশ পরিষ্কার করতে হবে।
- ঘরে ছাই মিশ্রিত বালু ছিটিয়ে দিতে হবে ফলে মাছির উপদ্রব কমে যাবে বা থাকবে না।
- বিশেষ করে বর্ষাকালে গোয়াল ঘরের চারপাশে ও নালা বা ড্রেনে ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে জীবাণু মুক্ত থাকে।
- মশা, মাছি বা মাকড়সা যেন বাসা বাধতে না পারে এজন্য ঘরের বেড়া ও চাল প্রায়শই ঝাড়ু দিতে হবে।
- মশা, মাছির উপদ্রপ থেকে রক্ষা করতে গোয়াল ঘরের চারপাশ দিয়ে নেট বা মশারি টানিয়ে দেয়া যেতে পারে।

গো-খাদ্য হিসাবে সবুজ ঘাস, দানাদার খাদ্য ও শুকনো খড়ের পাচ্যতা

- গো-খাদ্য হিসাবে সবুজ কাচা ঘাস খুবই উপাদেয় ও প্রয়োজনীয়। কথায় বলে গরু ঘাস খায়। অর্থ্যাৎ গরু শুধু ঘাস খেয়েই বাঁচতে পারে এবং সবুজ ঘাসের নিয়মিত প্রাপ্তিতে দৈহিক বৃদ্ধি হয়। সবুজ ঘাসের পরিপাচ্যতা বেশী।
- দানাদার গো-খাদ্য শর্করা, আমিষ, চর্বি, ইত্যাদি পুষ্টি উপাদান অধিক হারে থাকে বিধায় পরিপাকের ফলে বেশী পরিমানে বিপাকীয় শক্তি উৎপন্ন হয়। দানাদার খাদ্যের পরিপাচ্যতা বেশী।

- গো-খাদ্য হিসেবে বছরব্যাপী সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় শুকনো খড়। দেশে যে বিপুল পরিমাণ ধান চাষ হয়, তার খড়ের ব্যবহারের উওম পন্থা হলো গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার। সবুজ ঘাস সংরক্ষণের চেয়ে শুকনো খড় সংক্ষরণ সহজ বিধায় ইহা বছরব্যাপী ব্যবহৃত হয়। খড়ের পরিপাচ্যতা মাত্র ৪০-৪৫% ।অর্থাৎ ১০০ কেজি খড় খেলে তার মাত্র ৪০-৪৫ কেজি হজম হয় এবং বাকী ৫৫-৬০ ভাগ গোবর হিসেবে বেরিয়ে যায়। যেহেতু বছরব্যাপী শুকনো খড়ের প্রাপ্যতা তুলনামুলক বেশী তাই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এই খড় প্রক্রিয়াজাত করে এর পরিপাচ্যতা বাড়ানো হয়ে থাকে।

গো-খাদ্যে ইউরিয়া ব্যবহারে উপকারিতা

বাংলাদেশে বছরব্যাপী সহজপ্রাপ্য খড়ের পরিপাচ্যতা বৃদ্ধি করার জন্য শুকনো খড়ের সঙ্গে মোলাাসেস স্প্রে করে কিংবা শুধু ইউরিয়া প্রয়োগকরে কিংবা মোলাসেস ও ইউরিয়া মিশ্রণ ব্যবহার করে প্রক্রিয়াজাত করা হয়ে থাকে। এভাবে প্রক্রিয়াজাত করার ফলে গো-খাদ্য হিসেবে খড় অধিক উপাদেয় হয় এবং পরিপাচ্যতা ১০-১৫ ভাগ বেড়ে যায়। গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের ক্ষেত্রে ইউরিয়ার ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। নিয়ম মেনে ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় ও দানাদার খাদ্য খাওয়ানো অবশ্য কর্তব্য।

গো-খাদ্যে ইউরিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা

- গো-খাদ্যে প্রয়োজনের তুলনায় কম বা বেশী ইউরিয়া প্রয়োগ করা যাবে না।
- ছয় মাসের কম বয়সী বাছুর কিংবা অসুস্থ গরুকে ইউরিয়া মিশানো কোন খাদ্য খাওয়ানো যাবে না।
- গর্ভবতী গাভীকে গর্ভাবস্থার ৬ মাসের পর থেকেই ইউরিয়া মিশ্রিত খাদ্য ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে।
- ইউরিয়া মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ানোর পর গরু কোন প্রকার অস্বস্তি বোধ করলে বা এলার্জি দেখা দিলে খাওয়ানো বন্ধ রাখতে হবে।
- শুধু পানির সাথে কিংবা ভাতের মাড়ের সাথে ইউরিয়া খাওয়ানো যাবে না।
- ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় ৩ দিনের বেশী সংরক্ষন করা উচিৎ নয়।

গবাদিপশু ইউরিয়া বিষক্রিয়ার লক্ষণ

- নিয়মানুযায়ী প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পরিমাণমত খাওয়ালে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে এর ব্যতিক্রম ঘটলে বিষক্রিয়া হতে পারে।
- খাওয়ার পর অস্বাভাবিক লালা ঝরা ও পেট ফুলে যাওয়া।
- ঘন ঘন প্রস্রাব পায়খানা হওয়া।
- শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়া।
- শরীরের বিভিন্ন অংশের মাংস কাঁপতে থাকা।

গবাদিপশুতে ইউরিয়া বিষক্রিয়ায় করণীয়

- অতি দ্রুত ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
- সকল প্রকার ভারী খাদ্য খাওয়ানো বন্ধ রাখতে হবে।
- পশু যেন শুয়ে না পরে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- পেটে অতিরিক্ত গ্যাস মনে হলে ট্রকার-ক্যানুলা ব্যবহার করতে হবে যাতে গ্যাস বের হয়ে যায়।
- ভিনেগার বা সিরকা সমপরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে যেতে পারে।

গো-খাদ্য সংরক্ষণ

সবুজ ঘাস কেটে সরাসরি কিংবা খড়ের সাথে মিশিয়ে গরুকে খাওয়ানো যেতে পারে। এছাড়া উদ্বৃত্ত সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করলে বর্ষা ও শুষ্ক মৌসুমে গরুকে খাওয়ানো সম্ভব। সবুজ ঘাস দুইভাবে সংরক্ষণ করা যায়। যথা ঃ হে তৈরী করে কিংবা সাইলেজ তৈরি করে।

হে তৈরি

সবুজ ঘাসকে রোদে শুকিয়ে জলীয় অনুপাত কমিয়ে এনে সংরক্ষণ করা সম্ভব। সবুজ ঘাস সবুজ অবস্থায় রোদে শুখিয়ে সংরক্ষণ করা হলে উহাকে হে বলা হয়।

চিত্রঃ ধান মাড়াই এর পর হে সংরক্ষণ

সাইলেজ তৈরি

অবায়বীয় অবস্থায় সবুজ ঘাসকে যথাসম্ভব সবুজ ও রসালো রেখে গাজঁন প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এইভাবে প্রক্রিয়াজাত ঘাসকে বলা হয় সাইলেজ এবং যে স্থানে বা বৃহৎ কন্টেইনারে এই অবায়বীয় গাজঁন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় উহাকে বলা হয় সাইলো। এই প্রক্রিয়ায় ব্যাক্টেরিয়া কর্তৃক ঘাসের কার্বোহাইড্রেট অংশকে ভেঙে ল্যাকটিক এসিড ও অন্যান্য এসিডে রুপান্তর করে, ফলে সাইজের অম্লতা প্রায় ৪.০ এ নেমে আসে। ফলে কলস্ট্রিডিয়াম, কলির্ফম বা অন্যান্য রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া বাঁচতে পারে না, ফলে পুষ্টি উপাদানের পচন বা ক্ষতি হয় না। সাইলেজ তৈরি করার জন্য সাইলেজ পিট কিংবা বায়ু-প্রতিরোধক করে পলিথিনে ভরে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

চিত্রঃ সবুজ ঘাস পলিথিনে ভরে সাইলেজ তৈরি করা

সাইলেজ তৈরির উপকারিতা

- সবুজ ঘাসকে রসালো অবস্থায় সংরক্ষন করা যায়।
- সারা বছর ব্যাপী রসালো আঁশজাতীয় পশুখাদ্যের নিশ্চয়তা।
- একসঙ্গে অধিক পরিমাণ সবুজ ঘাস সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- বড় খামারের জন্য খুবই উপযোগী।
- সবুজ ঘাসের যেসব কান্ড সবুজ অবস্থায় গরু খেতে পারে না, গাঁজন সম্পন্ন হলে উহা খাওয়ার উপযোগী নরম হয়।
- সাইলেজের ঘ্রাণ পশুর খাওয়ার রুচি বাড়িয়ে দেয়।

সাইলেজ করার উপযোগী ঘাস

- যেসব সবুজ ঘাসে ৬৫-৭০ ভাগ জলীয় অংশ এবং ৩০-৩৫ ভাগ শুষ্কবস্তু রয়েছে।
- যে সবুজ ঘাসে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, যেমন ঃ ভুট্টা, সরগম, জাম্বু ঘাস ইত্যাদি।
- মাসকলাই, খেসারী, কাউপি ইত্যাদি ঘাসে সরাসরি সাইলেজ তৈরী করা যায় না, তবে কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ ঘাসের সঙ্গে মিশিয়ে সাইলেজ তৈরী করা সম্ভব।

চিত্রঃ সাইলেজ তৈরি করার উপযুক্ত করে ভূট্টা ঘাস কর্তন

সাইলেজ তৈরীতে বিবেচ্য বিষয়াবলী

১. সঠিক ঘাস নির্বাচন ঃ সাইলেজের জন্য উপযোগী ঘাসে পর্যাপ্ত কার্বোহাইড্রেট থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ভুট্টা, সরগম, জাম্বু ঘাস উত্তম। নেপিয়ার, জার্মান বা পারা ঘাস দিয়ে সাইলেজ তৈরীতে মোলাসেস যোগ করতে হবে।

২. সঠিক বয়সে ঘাস কর্তন ঃ ঘাসে ফুল আসার পূর্বেই কেটে নিয়ে সাইলেজ করতে হবে।

৩. সঠিক জলীয় অনুপাত ঃ ঘাসে যদি ৬০-৭০ ভাগের বেশি জলীয় অংশ থাকে তবে রোদে শুকিয়ে নেয়া যেতে পারে। রোদের অভাবে শুকানো সম্ভব না হলে সবুজ ঘাসের সঙ্গে শুকনো খড় মিশানো যেতে পারে। ফলে মোট জলীয় অংশ কাংখিত মাত্রায় থাকবে।

৪. অবায়বীয় অবস্থা নিশ্চিতকরন ঃ সাইলো এর ভিতরে বাতাস বেশী থাকলে অক্সিডেশন হবে, ফলে পুষ্টি উপাদান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৫. সাইলো আটসাটভাবে ভরানো ঃ সাইলোতে ঘাস যতো আটসাটভাবে রাখা যাবে, ততো বেশী অবায়বীয় অবস্থা সৃষ্টি হবে। প্রয়োজনে ঘাস কেটে টুকরো টুকরো করে সাইলো করা যেতে পারে।

উন্নত জাতের ঘাস চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। দেশের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ কোনো না কোনোভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে হাল চাষের পাশাপাশি গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ ও দুগ্ধজাত গাভী পালনের জন্য উন্নত জাতের ঘাস চাষ প্রয়োজন। আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত জাতের ঘাস চাষ করে এবং গবাদির পশুর সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। সেজন্য দরকার ব্যাপকভাবে উচ্চ উৎপাদনশীল ঘাস চাষ করা।

গবাদি প্রাণির খাদ্যে কাঁচা ঘাস সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা

* দৈহিক ওজন বৃদ্ধি ঘটে।
* অধিক মাংস পাওয়া যায়।
* খাদ্য খরচ কম হয়।
* দানাদার খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কম হয় ফলে উৎপাদন ব্যয় কমে যায়।
* লাভ বেশী হয় ফলে কৃষক গরু পালনে উৎসাহিত হয়।
* রোগ-ব্যাধি কম হয় ফলে চিকিৎসা খরচ কমে যায়।
* গরুর মৃত্যু হার খুবই কম হওয়াতে আর্থিক ক্ষতি হয় না।

বিভিন্ন ধরণের উন্নত জাতের ঘাস চাষ করা যায়। যেমন ঃ নেপিয়ার ঘাস, পারা ঘাস, জার্মান ঘাস, সাথী ঘাস এবং ভুট্টার কচি সবুজ গাছ। তবে স্থায়ী ঘাসের মধ্যে নেপিয়ার, পারা, জার্মান উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় এগুলো খুব ভাল হয়। এছাড়াও কচি অবস্থায় এসব ঘাসের পুষ্টিমান বেশী থাকে। গবাদি প্রাণির জন্য এগুলো অত্যন্ত উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য।

১। **নেপিয়ার ঘাস ঃ** মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথমেই জাতের উন্নয়ন আবশ্যক। তারপরই আসে খাদ্যের ভূমিকা। খাদ্যের মধ্যে কাঁচা ঘাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাঁচা ঘাসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নেপিয়ার ঘাস গরুর জন্য অনেক সুষম খাদ্য। আর কাঁচা ঘাস সহজ প্রাপ্য হলে গরু পালনও সহজতর হবে। বাংলাদেশের প্রায় সকল এলাকায় এ ঘাস জন্মানো সম্ভব এবং তা থেকে প্রায় সারা বছরই গবাদির কাঁচা ঘাসের চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে। এই ঘাসটির নাম নেপিয়ার ঘাস। নেপিয়ার এক প্রকার স্থায়ী ঘাস। দেখতে আখের মতো, লম্বা ৬.৫-১৩.০ ফুট বা তার চেয়েও বেশি হয়ে থাকে। এই ঘাস দ্রুত বর্ধনশীল, সহজে জন্মে, পুষ্টিকর, সহজপাচ্য ও খরা সহিষ্ণু। একবার রোপন করলে ৩/৪ বছর পর্যন্ত এর ফলন পাওয়া যায়। শুধুমাত্র শীতকালীন ২/৩ মাস ছাড়া প্রায় সারা বছর অব্যাহত থাকে।

চিত্র ঃ নেপিয়ার ঘাস

জমি নির্বাচন ঃ পানি নিষ্কাশনের জন্য ভাল ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ যেখানে বৃষ্টি বা বর্ষার পানি জমে থাকে না এরকম জমি নেপিয়ার চাষের জন্য উত্তম। তবে সব ধরনের মাটিতেই এ ঘাস রোপন করা যায়, তবে বেলে-দোআঁশ মাটিতে সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

২। পারা ঘাস ঃ পারা বর্ষার সময় সারি করে লাগাতে হয়। দুই সারির মধ্যবর্তী দূরত্ব ১.৫ ফুট। তবে এই ঘাসের সারি থেকে সারিতে কাটিংয়ের দূরত্ব তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। উঁচু-নিচু সব মাটি-জমিতেই জন্মে। এমনকি আবদ্ধ পানি ও লোনা মাটিতেও এ ঘাস জন্মানো সম্ভব। এই ঘাসের কাটিং বা মূল লাগানো যায়। লাগানোর ৪০-৫০ দিন পরই ঘাস কেটে খাওয়ানো যায়। পরে অবস্থা অনুযায়ী ৪-৭ সপ্তাহ পর পর ঘাস কাটা যাবে। একর প্রতি বছরে উৎপাদন ৪০,০০০-৪৫,০০০ কেজি। তবে গোড়া থেকে ৪-৫ র্ র্ রেখে কাটতে হবে।

চিত্র ঃ পারা ঘাস

জমি নির্বাচন ঃ বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এ ঘাস লাগানো যায়। তবে গ্রীষ্মের আগে জমি চাষ দিয়ে প্রস্তুত করে লাগাতে হবে। গ্রীষ্মের এক পশলা বৃষ্টি হলেই এ ঘাস লাগানো যায়। পারা ঘাসের চাষের জন্য বিশেষ কোনো যত্ন নিলেও চলে। তবে ভালো ফসলের জন্য জমি প্রস্তুতের সময় প্রতি একরে ৪ টন গোবর অথবা কম্পোস্ট সার এবং ৩৫ কেজি টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে। ঘাস লাগোনোর ২-৩ সপ্তাহ পর একরপ্রতি ৩৫ কেজি ইউরিয়া সার দিতে হয়। প্রতিবার ঘাস কাটার পর একরপ্রতি ৩৫ কেজি ইউরিয়া।

৪। **সাথী ঘাস ঃ** নেপিয়ার ঘাসের সঙ্গে গুটি চাষ করলে একদিকে যেমন জমির উর্বরতা বাড়ে অন্যদিকে ঘাসের পুষ্টিমাণও বৃদ্ধি পায়। স্থায়ী গুটি যেমন সেন্ট্রোসীমা, পয়রো, সিরাট্রো ইত্যাদি এবং অস্থায়ী গুটি যেমন বারসীম, কাউপি, মাসকালাই ও খেসারী ইত্যাদির চাষ করা যেতে পারে। দুই সারি নেপিয়ারের মাঝে এই ঘাসের চাষ করতে হয়।

ঘাস কাটার নিয়ম ঃ কাটি বা মোথা লাগানোর ৬০-৭০ দিন পর প্রথমবার ঘাস সংগ্রত করা যায় এবং এর পর প্রতি ৬-৮ সপ্তাহ পরপর জমি হতে ঘাস সংগ্রহ করা যায়। মাটির ৫-৬ ইঞ্চি উপর থেকে ঘাস কাটতে হয়।

প্রথম কাটিং-এ ফলন একপু কম হলেও দ্বিতীয় কাটিং থেকে পরবর্তী ২/৩ বছার পর্যন্ত ফলন বাড়াতে থাকে। এরপর আস্তে আস্তে কমতে থাকে। বৎসরে প্রতি হেক্টওে ১৪০-১৮০ টনের মত ঘাস উৎপাদিত হয়।

খাওয়ানোর নিয়ম ঃ জমি থেকে ঘাস কাটার পর ঘাস শুকিয়ে না যায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। আস্তা ঘাস গবাদিকে খেতে দিলে অপচয় বেশি হয়। তাই মেশিন, দা অথবা কাঁচি দ্বারা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা করে কেটে খাওয়ানো ভাল। এই কাটা ঘাস খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

৪। **জার্মান ঘাস ঃ** জার্মান ঘাসের মূল বা কান্ড লাগাতে হয়। এই ঘাস খাল, বিল, নদীর ধার, বা জলাবদ্ধ জমিতে হয়। নেপিয়ার ঘাসের মতই জমি তৈরী করে ঘাসের মূল বা কাটিং লাগানো যায়। বৈশাখ- জৈষ্ঠ্য মাস এ ঘাস রোপণ করার উপযুক্ত সময়। নেপিয়ার ঘাসের মতই সারিবদ্ধ করে লাগানো হয়। জার্মান ঘাসের জমি সব সময় ভেজা থাকতে হয়। ঘাস লাগানোর ৪৫-৬০ দিন পরই প্রথম বার কাটা যায়। পরবর্তীতে ৪/৫ সপ্তাহ পর পর কাটা যাবে। ফলন বছরের একর প্রতি ৪০,০০০-৪৫,০০০ কেজি ঘাস পাওয়া যেতে পারে।

চিত্র ঃ জার্মান ঘাস

৫। **ভুট্রার কচি সবুজ গাছ ঃ** ভুট্রার কচি সবুজ গাছ গবাদি প্রাণির অত্যন্ত পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য। আমাদের দেশে এখন প্রচুর ভুট্রা চাষ হচ্ছে। উঁচু/নিচু কিন্তু পানি জমে থাকে না এরকম জমিতে ভুট্রার চাষ করা যায়। বছরের সকল সময় ভুট্রার চাষ করা যেতে পারে। উঁচু জমিতে সেচের ব্যবস্থা থাকলে একই সময়ে কার্তিক অগ্রাহয়ণ মাসে ভুট্রার চাষ করা যেতে পারে।

হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ

মাটি ছাড়া শুধু মাত্র পানি ব্যবহার করে ঘাস চাষ করাকে হাইড্রোপনিক ঘাস বলে। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। অপরদিকে বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতেও মেধাবী জাতি গঠনে প্রচুর পরিমাণ দুধ ও মাংস উৎপাদন

করা প্রয়োজন। দুধ ও মাংস উৎপাদন করতে হলে গাভীর জন্য প্রচুর পরিমাণে কাঁচা ঘাসের প্রয়োজন। আমাদের দেশের অনেক খামারির ঘাস চাষের জমি নেই এবং আবার কিছু খামারি আবাদি জমিতে ঘাস চাষ করতে ও চান না। অথচ প্রতি ৩০০ থেকে ৪০০ কেজি ওজনের একটি গাভীকে দৈনিক ১৫ থেকে ২৫ কেজি কাঁচা ঘাস দিতে হবে। হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ করতে জমির প্রয়োজন হয় না তাই ইচ্ছা করলেই সব খামারী খুব সহজেই এ পদ্ধতিতে ঘাস চাষ করে গরুকে খাওয়াতে পারেন। এ ঘাসে বাজারের দানাদার ও মাঠের সবুজ ঘাসের প্রায় সব পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান। তাছাড়া উৎপাদন খরচও খুবই কম। (প্রতি কেজি ১.৫০-২.০০ টা.)

চাষের স্থান ঃ ঘরের ছাদ, ঘরের ভেতরে, নেটহাউস, পানির টানেল, বারান্দা, খোলা জায়গায়, প্লাস্টিকের বালতি, পানির বোতল, মাটির পাতিল ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

ব্যবহৃত বীজ ঃভুট্টা, গম, ছোলা, সয়াবিন, খেসারি, মাষকলাই এবং বার্লি।

চিত্রঃ পুষ্টিগুণে ভরা হাইড্রোপনিক ঘাস চাষ

চাষ পদ্ধতি

- বীজ ১২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- পানি ঝরিয়ে ভেজা চটের বস্তা বা কালো সুতির কাপড়ের ভেতরে বেঁধে ২৪ ঘণ্টা অন্ধকারে রাখতে হবে।
- একপাশ ছিদ্রযুক্ত কাঠ, টিন বা প্লাস্টিকের ট্রেতে ওই বীজ বিছিয়ে কালো কাপড় দিয়ে দুই দিন ঢেকে রাখতে হবে, যেন বাইরের আলো-বাতাস না লাগে। কাপড় সারাক্ষণ ভেজা রাখতে হবে।

- তৃতীয় দিন কাপড় সরিয়ে আধা ঘণ্টা পর পর পানি ছিটিতে হবে। একটি ঘরে বাঁশ বা কাঠের তাক বানিয়ে ট্রেগুলো সাজিয়ে রাখতে হবে।
- ৯ দিন পর ৭ থেকে ৮ কেজি কাচা ঘাস পাওয়া যাবে। ৫ বিঘা জমিতে যে ঘাস উৎপাদন হয় মাত্র ৩০০ বর্গফুট টিন শেড ঘরে তার সমপরিমাণ ঘাস উৎপাদন করা সম্ভব।

হাইড্রোপনিক ঘাসের উপকারিতা

- সবুজ ঘাস উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- স্বল্প জায়গায়, অল্প পরিসরে অধিক ঘাস উৎপাদন করা যায়।
- আঁশ জাতীয় খাদ্যের শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগই হাইড্রোপনিক ঘাস খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। ১০ থেকে ১৫ ভাগ দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। দুধের ফ্যাট ও এস এন এফ শতকরা ০.৩ থেকে ০.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।
- এ ঘাস শতকরা ৯০ ভাগ হজমযোগ্য পক্ষান্তরে একই বীজের দানাদার খাবার মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ হজমযোগ্য।
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার নেই।
- এ ঘাসে দানাদারের চেয়ে ১০ থেকে ২০ গুণ বেশি পরিমাণের ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, ভিটামিন সি বিদ্যামান।
- গর্ভধারণের হার বৃদ্ধি পায় কারণ এ ঘাসে ভিটামিন ই, সেলিনিয়াম, ভিটামিন এ পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান।
- শতকরা ২৫ ভাগের অধিক ঘাসের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- এ ঘাসের আঁশ উদ্ভিজ আমিষ, নানাবিধ ভিটামিন ও খনিজ লবণের উৎস।
- এ ঘাস সারা বছরই চাষ করা যায়। মাটিবাহিত রোগ হবে না। কীটপতঙ্গ আক্রমণের সম্ভাবনা নেই তাই কীটনাশক ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না।
- দানাদার খাবারে যে এন্টিনিউট্রিশনাল ফ্যাকটস হিসেবে ফাইটিক এসিড থাকে সেটাকে দূরীভূত করে রুমেনের পিএইচ কমায় ফলে শরীরের ইমিউনিটি ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে।
- পরিকল্পিতভাবে চাষ করা যায় (ছোট/বড়)।
- এটি লাভজনক ও মানসম্পন্ন ফসল।
- অধিক রসালো ও পরিপাচ্য হওয়ার কারণে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- এটি অধিক পরিবেশ উপযোগী।

গরুর সুষম খাদ্য

- দৈনন্দিন সরবরাহকৃত পশুখাদ্যে যদি প্রয়োজনীয় মোট পুষ্টি উপাদান আনুপাতিক হারে থাকে এবং খাদ্যে প্রয়োজনীয় অনুপাতে আঁশ থাকে তবে উহাকে উক্ত পশুর জন্য সুষম খাদ্য বলা যাবে।

খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা

- যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে এক কেজি দৈহিক ওজন বৃদ্ধি ঘটে তার অনুপাতকে উক্ত পশুর খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা বলে। যেমন, ৫ কেজি খাদ্য খেয়ে যদি ১ কেজি ওজন বৃদ্ধি হয় তবে খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা ৫:১ হবে।
- পশুর কৌলিক গঠন, সেক্স, পরিবেশ ও খাদ্যের মানের দ্বারা খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা প্রভাবিত হয়ে থাকে।
- পশুর কৌলিক গঠনের চেয়ে খাদ্য ও পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে দ্রুত খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা বাড়ানো যায়।
- দেশী গরুর চেয়ে সংকর এবং সংকর গরুর চেয়ে বিদেশী মাংসল জাতের গরুর খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা ভালো।
- খাদ্য রূপান্তর দক্ষতার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো হলোঃ

(ক) পশুর দৈহিক ওজন ও বয়স-পশুর দৈহিক ওজন ও বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা কমতে থাকে;

(খ) পশুর স্বাস্থ্য-রোগ বালাই, কৃমি ও খাদ্য গ্রহণে অনিহা খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা কমিয়ে দেয়;

(গ) বাহ্যিক পীড়ন-যথেষ্ট জায়গা না থাকলে, বিভিন্ন আকার ও বয়সের গরু একসঙ্গে রাখলে, খাদ্য পর্যাপ্ত ফ্রেশ না হলে এবং ঘরের ভেন্টিলেশন ভালো না হলে খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা কমে যাবে;

(ঘ) পুষ্টি-খাদ্যের স্ট্রাকচারাল ফাইবার গরুর জাবর কাটার হার বাড়িয়ে তোলে ও অন্ত্রে এসিডের চাপ কমায়, বেশী লম্বা বা বেশী খাটো আকারের খাদ্য এবং রেশনের অসুষমতা খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা কমাতে পারে;

(ঙ) খাদ্য- খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা বাড়লে খাদ্য খরচ কমে যাবে এবং অপ্রচলিত খাদ্য উপাদান খাদ্য মূল্য কমিয়ে রাখতে হবে।

গো-খাদ্যে পুষ্টি ব্যবস্থাপনা

- হৃষ্টপুষ্ট করার ক্ষেত্রে গরুকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ফেজে খাদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন রেখে সরবারাহ করতে হয়। যথাঃ রিয়ারিং ফেজ, গ্রোয়িং ফেজ এবং ফিনিশিং ফেজ, অতঃপর বাজারজাতকরণ করতে হয়।
- হৃষ্টপুষ্টকরণ গুরুর পূর্ব পর্যন্ত বয়সে গরু লালন পালন কে রিয়ারিং ফেজ ধরা হয়।

বিবেচ্য আইটেম	গ্রোয়িং ফেজ	ফিনিশিং ফেজ
শুষ্ক পদার্থ গ্রহণ (দৈহিক ওজনের)	২.৩%	২%
দৈনিক ওজন বৃদ্ধি	০.৭-১.৩ কেজি	১.৪ কেজি
খাদ্যে শুষ্ক পদার্থ	৩০-৬০ %	৩০-৬০ %
খাদ্যে ক্রুড প্রোটিন (ডিএম ভিত্তিতে)	১৫-১৬ %	১২-১৫ %
শুষ্ক পদার্থে বিপাকীয় শক্তি	১০.৫-১১.৪ মেগাজুল/কেজি	১২.২ মেগাজুল/কেজি
এনডিএফ-হজমযোগ্য	৪০ % এর বেশী	২৫% এর বেশী
চর্বি (ডিএম ভিত্তিতে)	৩% এর কম	৬% এর কম
স্টার্চ ও সুগার (ডিএম ভিত্তিতে)	২০% এর কম	৩৩% এর কম
ক্যালসিয়াম (ডিএম ভিত্তিতে)	০.৮ %	০.৬%

- গোখাদ্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান সঠিক অনুপাতে থাকতে হবে, সুস্বাদু ও সহজ পরিপাচ্য হতে হবে, পুষ্টির চাহিদা পুরণ হতে হবে এবং পেটও ভরতে হবে।
- খাদ্যেপাদান তাজা, টাটকা ও মানসম্মত হতে হবে। ময়লা, কাকড়, ধুলা-বালি, ছত্রাক যুক্ত দানাদার খাদ্য দেয়া উচিত নয়।
- দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় কাচা সবুজ ঘাস, খড় ও দানাদার খাদ্য উপাদানের সমন্বয় অত্যাবশ্যক।
- সবুজ ঘাস তাজা অবস্থায় এবং আঁশ জাতীয় ঘাস ও খড় কেটে ছোট করে পানি ও মোলাসেস/নালীগুড় মিশিয়ে নরম করে খেতে দিতে হবে।
- গরুর দৈনিক খাদ্য সুষম করার লক্ষ্যে মূলতঃ শক্তি (কার্বোহাইড্রেট) ও আমিষ এর বিষয়ে বেশী নজর দিতে হয়। এই পুষ্টি উপাদান বিভিন্ন খাদ্য উপাদানে বিভিন্ন গঠনে থাকে এবং পরিপাকতন্ত্রে বিভিন্ন হারে সহজ প্রাপ্য হয়ে থাকে।
- অর্থাৎ পরিপাক প্রক্রিয়ায় শক্তি ও আমিষের সুষম ভাঙন রুমেনের হজম (গাঁজন) ক্রিয়া ও পশুস্বাস্থ্যের কাঙ্খিত দক্ষতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- আঁশ জাতীয় খাদ্য দুইটি ভিন্ন গঠনের হয়ে থাকে। যেমন, স্ট্রাকচারাল ফাইবার-সবুজ ঘাস, খড় ইত্যাদি গরুর মুখের মাজেলের আকারের থেকে বড় হওয়া অবাঞ্চনীয়; হজমযোগ্য আঁশ-সুগার বিট পাল্প, গমের ভূষি, ধানের কুড়া।
- যেসব আঁশ জাতীয় খড় বা ঘাস (শুষ্কনো ধানের খড়, শুষ্ক ঘাস, মোটা সাইলেজ) গরুর রুমেনে ধীরে ধীরে হজম হয় তার সাথে দ্রুত হজম (গাঁজন প্রক্রিয়ায়) হয় এমন কার্বোহাইড্রেট মোলাসেস,গম/ভুট্রার আটা, ক্ষুদে ভাত) ও পাকস্থলীতে দ্রুত ভেঙ্গে নাইট্রোজেন তৈরী করে এমন প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সরবরাহ দিতে হবে, ফলে রুমেন অধিক কার্যক্ষম থাকবে এবং রুমেনস্থিত মাইক্রোফ্লোরা অধিক কার্যক্ষম থাকবে।
- গরুর রুমেনে দ্রুত হজম (গাঁজন প্রক্রিয়ায়) হয় এমন কার্বোহাইড্রেট (মোলাসেস, গম/ভুট্রার আটা, ক্ষুদের ভাত) এর সাথে পাকস্থলীতে দ্রুত ভেঙ্গে নাইট্রোজেন তৈরী করে এমন প্রোটিন

জাতীয় খাদ্য এবং রুমেনে ধীরে ধীরে হজম হয় এমন কার্বোহাইড্রেট এর সাথে পাকস্থলীতেধীরে ধীরে ভেঙ্গে নাইট্রোজেন তৈরী করে এমন প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সরবরাহ দিতে হবে, ফলে গরুর মাংস বৃদ্ধির দক্ষতা ভালো থাকবে।

- প্রতিটি গরু তার দৈহিক ওজনের প্রায় ২.৫-৩.০% হারে শুষ্ক পদার্থ ভক্ষণে সক্ষম, ফলে খাদ্য তৈরী ও দৈনন্দিন সরবরাহে সে দিকটি লক্ষ্য রাখতে হবে।
- দৈনন্দিন পশুখাদ্য প্রতি কেজিতে গড় ১১ মেগাজুল বিপাকীয় শক্তি ও শুষ্ক পদার্থের ১৫% ক্রুড প্রোটিন থাকতে হবে।
- দানাদার খাদ্যে ০.৫-১% হারে খনিজ লবণ ও পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি খেতে দিতে হবে।

একটি মাঝারি আকারের (১০০ কেজি) এড়েঁ বাছুরের জন্য সুষম তিনটি খাদ্য তালিকা নিম্নরূপ

ক) পর্যাপ্ত সবুজ ঘাস এবং ৮০০ গ্রাম থেকে ১.০ কেজি খাদ্য মিশ্রণ প্রতিদিন অথবা

খ) ২.৫ কেজি ইউএমএস, ৬.০ কেজি সবুজ ঘাস এবং ৮০০ গ্রাম থেকে ১.০ কেজি দানাদার খাদ্য মিশ্রণ প্রতিদিন অথবা

গ) ৪.০ কেজি ইউএমএস, ৩. কেজি সবুজ ঘাস এবং ৮০০ গ্রাম থেকে ১.০ কেজি দানাদার খাদ্য মিশ্রণ প্রতিদিন।

দানাদার খাদ্য মিশ্রণ	
ক) ভূট্টা/চাল/গম ভাঙ্গা	২০ ভাগ
খ) গমের ভূষি ও ধানের কুড়া (১:১)	৫০ ভাগ
গ) সয়াবিন মিল বা ফিসমিল	৫ ভাগ
ঘ) তিল/বাদাম/সরিষা খৈল	২৪.২৫ ভাগ
ঙ) লবণ	০.৭৫ ভাগ
চ) বিশুদ্ধ পানি	পর্যাপ্ত

শুকনো খড়ের সাথে ইউরিয়া খাওয়ানোর কৌশল

শুকনো খড়ের সাথে ইউরিয়া খাওয়ানো যায়। ইউরিয়ার সাথে মোলাসেস মিশিয়ে উহা শুকনো খড়ের উপর স্প্রে করে অতঃপর নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী গরুকে খাওয়াতে হবে। এজন্য ৮২ ভাগ খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেস ও ৩ ভাগ ইউরিয়া সার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খড় প্রক্রিয়াজাতকরণ কিভাবে করতে হবেঃ

শুকনো খড়	মোলাসেস	ইউরিয়া	বিশুদ্ধ পানি
১ কেজি	০.২১-০.০২৫ কেজি	৩০ গ্রাম	০.৫-০.৭৫ লিটার
৫ কেজি	১.০৫-১.২০ কেজি	১৫০ গ্রাম	২.৫-৩.৫ লিটার
১০ কেজি	২.১০-২.৪০ কেজি	৩০০ গ্রাম	৫-৭ লিটার

- প্রথমে প্রয়োজনীয় সব উপাদান যেমন শুকনো খড়, মোলাসেস, ইউরিয়া ও পানি সঠিকভাবে মেপে নিতে হবে।
- অত:পর পানিতে ইউরিয়া সার মিশিয়ে হালকা নাড়িয়ে গুলিয়ে নিয়ে এবং উহাতে মোলাসেস ঢেলে খুব ভাল ভাবে মিশ্রণ তৈরী করে নিতে হবে।
- খড় ৩-৪ ইঞ্চি টুকরো করে কেটে নিতে হবে।
- ইউএমএস তৈরী করে তাৎক্ষনিক সময় থেকে পরবর্তী ৭২ ঘন্টা বা ৩ দিন পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াজাত খড় আস্তে আস্তে গরুকে খাওয়ানো যায়।
- ৩ দিনের পর থেকে আর প্রক্রিয়াজাত সংরক্ষিত খড় খাওয়ানো উচিৎ না।
- এভাবে প্রক্রিয়াজাত খড় নিয়মিত খাওয়ালে মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

চিত্রঃ ইউরিয়া মোলাসেস খড় তৈরি

দানাদার খাদ্যের সাথে ইউরিয়া খাওয়ানোর কৌশল

দানাদার খাদ্যের সাথেও ইউরিয়া মোলাসেস খাওয়ানো যায়। এক্ষেত্রে ইউরিয়া ও মোলাসেস দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে ব্লক তৈরী করে অতঃপর খাওয়াতে হবে। ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক বা ইউএমবি তৈরী করা যায়।

- ইউএমবি তৈরীর জন্য ৫০-৬০ ভাগ মোলাসেস, ২৫-২৬ ভাগ গমের ভূষি, ৮-৯ ভাগ ইউরিয়া ও ৫-৬ ভাগ পাথরে চুন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
- ১০ কেজি ইউএমবি তৈরীর জন্য ৫ কেজি মোলাসেস, ২.৫-৩.০ কেজি গমের ভূষি, ৭০০-৮০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০-৬০০ গ্রাম চুন, ৩০-৫০ গ্রাম লবণ, বড় কড়াই, নাড়ানী কাঠি, ইত্যাদি প্রয়োজন হবে।
- পাথুরে চুন ভেঙ্গে গুড়ো করে নিতে হবে; লবণ, ইউরিয়া, চুন একত্রে মিশিয়ে প্রস্তত রাখতে হবে।
- কড়াইতে প্রয়োজনীয় মোলাসেস ঢেলে চুলায় উওপ্ত করে নিতে হবে এবং উহাতে লবণ, ইউরিয়া ও চুনের মিশ্রণ ঢেলে নাড়ানী দিয়ে নেড়ে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।
- অতঃপর উহাতে গমের ভূষি অল্প অল্প করে মিশিয়ে নাড়াতে হবে। এভাবে সবটুকু ভূষি সমানভাবে মেশানো হলে সেমি সলিড আঠালো জমাট মিশ্রন তৈরী হবে।
- এভাবে প্রস্ততকৃত ইউএমবি শুষ্ক অবস্থায় প্রতিটি গরুকে অন্যান্য স্বাভাবিক খাদ্যের পাশাপাশি দৈনিক ২৫০-৩০০ গ্রাম হিসেবে খাওয়ানো যেতে পারে।

গরুর জন্য সবুজ ঘাসের বিকল্প হিসেবে এ্যালজির (শেওলা) ব্যবহার

এ্যালজি একটি সম্ভাবনাময় খাদ্য যা আমরা পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। এ্যালজি হচ্ছে এক ধরনের ক্ষুদ্র এককোষি উদ্ভিদ যা কৃত্রিমভাবে পানিতে চাষ করে গরুকে সবুজ পানীয় হিসেবে খাওয়ানো হয়। গরুকে এ্যালজি খাওয়ানোর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।

এ্যালজির বৈশিষ্টঃ এ্যালজি এক ধরনের উদ্ভিদ যা আকারে এককোষী থেকে বহুকোষী বিশাল বৃক্ষের মত হতে পারে। তবে আমাদের আলোচ্য এ্যালজি এককোষী এবং দুই ধরনের যথা ক্লোরেলা ও সিনেডেসমাস। এরা পানিতে দ্রবিভূত অক্সিজেন, কার্বনডাই-অক্সাইড ও জৈব নাইট্রোজেন আহরণ করে সূর্যালোকে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বেঁচে থাকে। এরা অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল।

এ্যালজির পুষ্টিমানঃ শুষ্ক এ্যালজিতে শতকরা ৫০-৭০ ভাগ আমিষ, ২০-২২ ভাগ চর্বি ও ৮-২৬ ভাগ শর্করা থাকে। এছাড়া এ্যালজিতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন সি ও বিভিন্ন ধরনের বি-ভিটামিন থাকে। কেবলমাত্র 'সিসটিন' ছাড়া এ্যালজির প্রোটিনে বিভিন্ন ধরনের এমাইনো এসিডের অনুপাত প্রায় ডিমের প্রোটিনের সমান। জাবর কাটে এমন প্রাণিতে প্রোটিনের পাচ্যতা ৭০-৭৩%।

এ্যালজির উৎপাদন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

১। প্রথমে ছায়াযুক্ত জায়গায় একটি কৃত্রিম পুকুর তৈরি করতে হবে। পুকুরটি ১০ ফুট লম্বা, ৪ ফুট চওড়া এবং ০.৫ ফুট গভীর হবে। পুকুরের পাড় ইট বা মাটির তৈরি হবে। এবার ১১ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া একটি স্বচ্ছ পলিথিন বিছিয়ে কৃত্রিম পুকুরের তলা ও পাড় ঢেকে দিতে হবে। তবে পুকুরের আয়তন প্রয়োজন অনুসারে ছোট বা বড় হতে পারে। এছাড়া মাটির বা সিমেন্টের চাড়িতেও এ্যালজি চাষ করা যায়।

২। ১০০ গ্রাম মাসকলাই বা অন্য ডালের ভূষিকে ১ লিটার পানিতে সারা রাত ভিজিয়ে কাপড় দিয়ে ছেঁকে পানিটুকু সংগ্রহ করতে হবে। একই ভূষিকে অন্তত ৩ বার ব্যবহার করা যায় ও পরে গরুকে খাওয়ানো যায়।
৩। এবার কৃত্রিম পুকুরে ২০০ লিটার পরিমান কলের পরিষ্কার পানি, এ্যালজির ঘনত্বের উপর নির্ভর করে ১৫-২০ লিটার পরিমান এ্যালজির বীজ ও মাসকলাই ভূষি ভিজানো পানি ভাল ভাবে মিশাতে হবে। অতঃপর ২-৩ গ্রাম পরিমান ইউরিয়া উক্ত পুকুরের পানিতে ভালভাবে মিশাতে হবে।
৪। এরপর প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও বিকালে কমপক্ষে তিনবার উক্ত পুকুরের এ্যালজির কালচারকে নেড়ে দিতে হবে। পানির পরিমান কমে গেলে পরিমানমত নতুন পরিষ্কার পানি যোগ করতে হবে। প্রতি ৩ দিন পরপর পুকুরে প্রতি ১-২ গ্রাম পরিমান ইউরিয়া ছিটালে ফলন ভাল হয়।
৫। এভাবে ১২-১৫ দিন পর এ্যালজির পানি গরুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। এ সময় এ্যালজির পানির রং গাঢ় সবুজ রঙের হয়। এ্যালজির পানিকে পুকুর থেকে সংগ্রহ করে গরুকে খাওয়ানো যায়।
৬। একটি পুকুরের এ্যালজির পানি খাওয়ানোর পর উক্ত পুকুরে নিয়ম অনুযায়ী পরিমানমত পানি, সার ও মাসকলাই ভূষি ভিজানো পানি দিয়ে নতুন করে এ্যালজির চাষ শুরু করা যায়। এ সময় নতুন করে এ্যালজির বীজ দেয়ার প্রয়োজন নেই।

সাবধানতা

১। এ্যালজির পুকুরটি সরাসরি সূর্যালোকে না করে ছায়াযুক্ত স্থানে করতে হবে।
২। কখনই মাসকলাই ভূষি ভিজানো পানি পরিমানের চেয়ে বেশি দেয়া যাবে না।
৩। এ্যালজি পুকুরের পানিতে নিয়মিত নাড়াচাড়া করতে হবে।
৪। যদি কখনও এ্যালজি পুকুরের পানি গাঢ় সবুজ রং এর পরিবর্তে হালকা নীল রং ধারণ করে তবে তা ফেলে দিয়ে নতুন করে চাষ শুরু করতে হবে।

গরুকে এ্যালজি খাওয়ানো

এ্যালজির পানি সব ধরনের গরুকে অর্থাৎ বাছুর, বাড়ন্ত গরু, দুধের গাভী, গর্ভবতী গাভী, হালের বলদ সবাইকেই খাওয়ানো যায়। এ্যালজি খাওয়ানোর কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই। এটাকে সাধারণত পানির পরিবর্তে সরাসরি খাওয়ানো যায়। এ ক্ষেত্রে গরুকে আলাদা করে পানি খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। দানাদার খাদ্য ও খড়ের সাথে মিশিয়েও খাওয়ানো যায়। সাধারণত দুই-এক দিনের মধ্যেই পশু এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। গরু সাধারণত তার ওজনের প্রায় ৮ ভাগ অর্থাৎ ১৫০ কেজি ওজনের গরু ১২ কেজি পরিমান এ্যালজির পানি পান করে। তবে গরমের দিনে এর পরিমান বাড়তে পারে। এ্যালজির পানি গরম করে খাওয়ানো উচিৎ নয়। গরু যদি সংখ্যায় বেশি হয় তবে পূর্বে বর্ণিত আকারের ৫টি কৃত্রিম পুকুরে এ্যালজি চাষ করতে হবে যাতে একটির এ্যালজির পানি শেষ হতে হতে পরবর্তীটি খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। এ্যালজি চাষের বড় সুবিধা হচ্ছে এর জন্য কোন আবাদী জমির প্রয়োজন নেই। বাড়ীতে যেকোন ছায়াযুক্ত সমতল স্থানে ঘরের ভেতর বা ছাদেও চাষ করা যায়।

গবাদিপশুর রোগ পরিচিতি

গরুকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখা এবং গরু থেকে পর্যাপ্ত উৎপাদন পেতে হলে সঠিক ব্যবস্থাপনা ও যত্নের প্রয়োজন। তাছাড়া গরুকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে লালন-পালন করতে হবে। গবাদিপশু প্রতিপালনের অন্যতম সমস্যা রোগ-বালাই। গবাদিপশু রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত পদক্ষেপকে রোগপ্রতিরোধ বলা হয়। একটিপশু অসুস্থ হওয়ার পর তাকে আরোগ্য করতে চিকিৎসা ও ঔষধ ব্যয় তো আছেই, তদুপরি ভগ্ন স্বাস্থ্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনাও কষ্টসাধ্য। তাই রোগ যাতে পশুকে আক্রান্ত করার সুযোগ না পায় সে রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়। সে জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা ও সুষমখাদ্য খাওয়ানোর পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধের টিকা প্রদান করা উচিৎ। গবাদিপশুর রোগপ্রতিরোধক টিকাবীজ বাংলাদেশেই পাওয়া যায়। প্রাণিসম্পদ বিভাগ মুলত এসব ভ্যাকসিন উৎপাদন করে, তবে কিছু কিছু ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী সরকারের পূর্বানুমতি নিয়ে কিছু কিছু রোগের ভ্যাকসিন আমদানী করে থাকে।

গরু, মহিষ, ছাগল বা ভেড়ার জীবানুঘটিত, পরজীবিঘটিত, অপুষ্টিজনিত ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে গো-বসন্ত, ক্ষুরা রোগ, গলাফুলা, বাদলা, তড়কা, কিটোসিস, ম্যাস্টাইটিস, অন্যান্য কৃমিঘটিত রোগই প্রধান। গরুর এসব সংক্রামক রোগ দমনের জন্য রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক সময়ে টিকা প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া গরুকে চার মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।

গরুর কৃমিজনিত সমস্যা

গরুতে সাধারণত বহিঃপরজীবি ও অন্তঃপরজীবি আক্রমন বেশি হয়ে থাকে।

বহিঃপরজীবি

বহিঃপরজীবি বলতে আঠালী, উকুন প্রভৃতিকে বুঝায় যাদের আক্রমনে গরুর রক্তক্ষরণ ও উৎপাদন কম হয়ে থাকে। বহিঃপরজীবির আক্রমন থেকে গরুকে রক্ষা করতে হলে গরুকে নিয়োমিত গোসল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। এছাড়া গরুকে যথাযথ বহিঃপরজীবি নাশক ব্যবহার করতে হবে । অন্তঃপরজীবিনাশক কিছু ঔষধ আছে যা চামড়ার নিচে প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

অন্তঃপরজীবি

অন্তঃপরজীবি বলতে গরুর শরীরের ভিতরের কৃমির ক্ষতিকর প্রভাবকে বুঝানো হয়েছে। কৃমিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-

(ক) গোল কৃমি (খ) পাতা কৃমি বা কলিজা কৃমি ও (গ) ফিতা কৃমি।

এসব কৃমির আক্রমনে গরুর শরীরে-

- শরীরে পুষ্টি শোষণ করে পশুর পুষ্টিহীনতার কারণ ঘটায়।
- শরীরের অভ্যন্তরীন অঙ্গের রক্তক্ষরণ ঘটায় ও ক্ষত সৃষ্টি করে।
- স্বাস্থ্যহীনতা, রুচিহীনতা ও রক্তস্বল্পতার অন্যতম কারণ কৃমি।
- শরীরের পশম উস্ক-খুশকো থাকা, ধিরে ধিরে দুর্বলতার লক্ষণ ছাড়াও গলকণ্ঠের নীচে পানি জমা একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণও কৃমির আক্রমন।
- কৃমির আক্রমনে মহিষের কোষ্ঠ কাঠিন্য বা পাতলা পায়খানা হতে পারে। অনেক সময় গোবরের সাথে অল্প পরিমান আম, মিউকাস বের হতে পারে।
- কৃমি গরুর শরীরের অধিকাংশ অঙ্গেই বাসা বাধতে পারে।

প্রতিকার

প্রতিকার হিসাবে গরুকে প্রতি চার মাস অন্তর অন্তর অথবা বছরে কমপক্ষে দুই বার কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে বা ইনজেকশন প্রয়োগ করতে হবে। ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শে পশুর গোবর পরীক্ষা করে সে অনুযায়ী কৃমিনাশক প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ক্ষুরা রোগ (Foot and Mouth Disease-FMD)

প্রচলিত নাম ঃ বাতা, জ্বরা, ক্ষুরা পাকা, ক্ষুরা, তাপরোগ ক্ষুরাচল ইত্যাদি।

ক্ষুরা রোগ একটি ভাইরাসজনিত রোগ। আমাদের দেশের অনেক গবাদি প্রাণী প্রতি বছরই এ রোগে আক্রান্ত হয়। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। বাতাসের মাধ্যমে এ রোগটি

অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারে। গরু, মহিষের বাছুর এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এ রোগে আক্রান্ত প্রাণীর উৎপাদন ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। এ রোগটি সারা বছরই গবাদি প্রাণীতে দেখা যায়।

লক্ষণ

- প্রাথমিক অবস্থায় জ্বর হয়। তাপমাত্রা ১০৭ ডিগ্রী ফাঃ পর্যন্ত হতে পারে।
- জিহ্বা, দাঁতের মাড়ি, মুখের ভিতরে এবং পায়ের ক্ষুরের মাঝখানে ফোসকা পড়ে, এবং পরবর্তীতে ফোসকা ফেটে গিয়ে ঘা বা লাল ক্ষতের সৃষ্টি করে।
- মুখ দিয়ে লালা ঝড়তে থাকে, মুখে ফেনা বের হয়, চপ চপ শব্দ হতে থাকে।
- ক্ষুরের ফোসকা ফেটে ঘা হয়, পা ফুলে ব্যথা হয়। ঘা বেশি হলে চলাফেরা করতে কষ্ট হয়।
- পায়ের ঘায়ে মাছি বসে ডিম দিলে পোকা হয়ে পায়ের ব্যাথা বাড়ে , ফলে গরু পা ছুড়তে থাকে।
- গর্ভবতী গরু এ রোগে আক্তান্ত হলে গর্ভপাত হতে পারে।
- যদি গরুর বাচ্চা এ রোগে আক্তান্ত হয় তবে অধিকাংশ বাচ্চা মারা যায়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

১। আক্রান্ত প্রাণীকে সুস্থ প্রাণী থেকে আলাদা রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই প্রাণীকে কাঁদা বা পানিতে রাখা যাবে না।

২। এ রোগ মারাত্মক ছোঁয়াচে হওয়ায় আক্রান্ত প্রাণীকে এলাকার বাইরে নেওয়া বা পরিবহন করা উচিত নয়। পার্শ্ববর্তী এলাকার সকল সুস্থ পশুকে অবিলম্বে এ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।

৩। পা এন্টিসেপটিক ঔষধ দিয়ে পরিষ্কার করার পর সালফানিলামাইড পাউডার লাগাতে হবে এবং প্রাণীর পায়ে যত কম পরিমান পানি লাগে সে দিকে নজর দিতে হবে।

৪। পায়ের ক্ষতে যাতে মাছি বসে ডিম দিতে না পারে সে জন্য ক্ষুরের উপর তারপিন তেল বা ন্যাপথলিন মিশ্রিত নারিকেল তেল এর প্রলেপ দেয়া যেতে পারে।

৫। আক্রান্ত প্রাণীর যাতে চিবিয়ে খেতে না হয় এমন খাবার দিতে হবে। কুড়া-ভূষি পানিতে গুলিয়ে বা ভাতের মাড়ের সাথে দিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

৬। মুখের ঘা কুসুম গরম পানিতে সামান্য পটাশ দিয়ে ধোয়ানোর পর ৪% বোরোগ্লিসারিন বা মধুর সাথে সোহাগার খৈ মিশিয়ে চোয়ালের ভিতর, জিহ্বার উপর প্রলেপ দিতে হবে।

৭। সুস্থ পশুকে প্রতি চার মাস অন্তর অন্তর এ রোগের টিকা দিতে হবে।

৮। যত দ্রুত সম্ভব আক্রান্ত পশুকে রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। চিকিৎসা করার ১০-১২ দিন পর টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে ।

৯। মৃত পশুকে মাটিতে ৬ ফুট গর্ত করে পর্যাপ্ত চুন দিয়ে পুঁতে ফেলতে হবে।

চিত্রঃ ক্ষুরা রোগাক্রান্ত গরু

তড়কা (Anthrax)

তড়কা একটি তীব্র সংক্রামক রোগ। এতে আক্রান্ত পশু হঠাৎ মারা যেতে পারে। গরু ও মহিষে এ রোগটি ব্যাপকভাবে দেখা যায় তবে মানুষেরও এ রোগ হতে পারে। ব্যাসিলাস এনথ্রাসিস (*Bacillus anthrasis*) নামক ব্যাকটেরিয়া এ রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। এ রোগ বিক্ষিপ্ত ভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের মড়ক হিসাবে দেখা দিতে পারে। রোগাক্রান্ত প্রাণীর মল ও দেহ নিঃসৃত অন্যান্য পদার্থের সাথে এ জীবানু বের হয়ে মাটি, ঘাস ও পানিকে দুষিত করে। জীবাণু বায়ুর সংস্পর্শে এসে স্পোর গঠনকরে এবং মাটিতে অনেক বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। এ রোগে মৃত পশু মাটিতে উন্মুক্ত

অবস্থায় ফেলে রাখলে সহজেই পরিবেশকে কলুষিত করে। এ রোগের জীবানুর স্পোর মাটিতে ৩০ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে।

লক্ষণ

অতি তীব্র মাত্রায় তড়কা রোগের ক্ষেত্রে আক্রান্ত পশু হঠাৎ মারা যায়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিকিৎসার পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না। তীব্র মাত্রায় আক্রান্ত পশু মাঠে বা বাড়ীতে হঠাৎ লাফ দিয়ে পড়ে মারা যায়। এ সময় আক্রান্ত পশুর কাছে থাকলে অগভীর ও দ্রুত নিঃশ্বাস পরিলক্ষিত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে পশু মৃত্যু কোলে ঢলে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে পশু ১ থেকে ৬ ঘন্টা পর্যন্ত বেঁচে থাকে। আক্রান্ত পশুর দেহের তাপমপত্রা ১০৪-১০৭ ডিগ্রি ফাঃ পর্যন্ত উঠে পরে। প্রথমে দৈহিক উত্তেজনা, মাংস পেশীর কম্পন এবং শেষে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পরে। অনেক সময় নাক, মুখ, প্রস্রাব ও মলদ্বার দিয়ে রক্ত মিশ্রিত রস নির্গত হয় এবং পশু মাটিতে পড়ে মারা যায়।

মৃত্যুর পরবর্তী লক্ষণ

মৃত পশুর পেট অস্বাভাবিকভাবে ফুলে উঠে, নাক,মুখ, প্রসাব ও মলদ্বার দিয়ে আলকাতরার মত কাল বর্ণের রক্ত বের হয়। মৃতদেহ শক্ত হয় না এবং অতি তাড়াতাড়ি পচন শুরু হয়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

১। রোগাক্রান্ত পশু থেকে সুস্থ্য পশুকে আলাদা রাখতে হবে। কোন পশু এ রোগে মারা গেলে মৃত প্রাণিকে মাঠে ফেলে রাখা, নদীতে ভাসিয়ে দেয়া বা মুচিকে চামড়া ছাড়াতে দেয়া যাবে না। মৃত প্রাণিকে কমপক্ষে ৬ ফুট গভীর গর্ত করে পুতে রাখতে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সম্ভব হলে চুন দিয়ে ঢেকে এবং চারিদিকে বেড়া দিতে হবে। যথাসম্ভব হলে মৃতদেহ মৃত্যুর স্থানেই সৎকার করা উচিত।

২। যত দ্রুত সম্ভব আক্রান্ত পশুকে রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। চিকিৎসা করার ১০-১২ দিন পর টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে ।

৩। প্রতি বছর একবার সুস্থ প্রাণীকে এ রোগের প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।

চিত্রঃ তড়কা রোগাক্রান্ত গরু

গলাফুলা (Haemorrhagic Septicemia)

প্রচলিত নামঃ ব্যাংগা, ঘটু, গলঘটু, গলারেরা, গলাফাস ইত্যাদি।

পাসচুরেলা মাল্টোসিডা নামক জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট গরু ও মহিষের একটি তীব্র সংক্রামক রোগ। জীবাণ বাহক পশুর ন্যাজো ফ্যারিনক্স এ থাকে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ও খাদ্যের মাধ্যমে অন্য পশুতে ছড়ায়। অত্যধিক পরিশ্রমে গরুর স্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে ভেঙ্গে পড়ে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায় তখন শ্বাসনালীতে অবস্থিত নিষ্কিয় জীবানু সক্রিয় হয়ে এ রোগ সৃষ্টি করে। মার্চ - মে মাসে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হয়।

লক্ষণ

অতি তীব্র প্রকৃতির রোগের ক্ষেত্রে কোন লক্ষণ প্রকাশ ছাড়াই গরু মারা যায়। অত্যধিক জ্বর, ক্ষুধা মন্দা, পেট ফাঁপা, পাতলা পায়খানা, মলের সাথে রক্ত যাওয়া, মাথা, গলা, বুক, পা অথবা লেজের গোড়া ফুলে যায়। পশুটি আস্তে আস্তে দূর্বল হয়ে যায় ও শরীরের তাপমাত্রা অনেক সময় কমে যায় । এ রোগে আক্রান্ত পশুর সাধারণত তীব্র শ্বাসকষ্ট হয়ে থাকে। শ্বাস ত্যাগের সময় ঘড় ঘড় শব্দ হয়, যা বেশ দূর থেকে শোনা যায়। নাসারন্ধ থেকে শ্লেষ্মা বের হওয়া , গলা ফুলে যাওয়া, ফুলে যাওয়া অংশে সূচ দিয়ে

ছিদ্র করলে হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ বের হওয়া এবং উচ্চ দৈহিক তাপমাত্রা প্রভৃতি লক্ষণ এ রোগে দেখা যায়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

১। অসুস্থ পশুকে আলাদা করে রাখতে হবে, পশুর মৃতদেহ মাটির নীচে পুতে ফেলতে হবে।

২। কোন অবস্থাতেই মাটির উপর, পানিতে ভাসিয়ে দেয়া বা মুচিদের দিয়ে চামড়া ছাড়ানো যাবেনা ।

৩। রোগ প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত ছয় মাস অন্তর অন্তর টিকা প্রয়োগ করতে হবে।

৪। বর্ষা মৌসুমে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী বিধায় বর্ষা শুরুর ১-২ মাস আগেই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা উচিৎ।

৫। আক্রান্ত পশুকে রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

চিত্রঃ গলাফুলা রোগাক্রান্ত গরু

বাদলা (Black quarter)

প্রচলিত নাম ঃ বাদলাপীড়া, জহরবাত, ভুরভুরি বেরাম, ব্ল্যাকলেগ ইত্যাদি।

বাংলাদেশে এ সংক্রামক রোগটি বৃষ্টি বা বর্ষার মৌসুমে হয় বলে বাংলায় এ রোগকে বাদলা বা বাদালী রোগ করা হয়। ক্লসট্রিডিয়াম চৌভিয়াই (*Clostridium chauvaei*) নামক ব্যাকটেরিয়া এ রোগের কারণ। অল্প বয়স্ক গরু এতে আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুর হার ৯০-৯৫% পর্যন্ত হতে পারে। উর্বর, নীচু

এবং জলযুক্ত স্যাঁতস্যাঁতে স্থানেই এ রোগের জীবানু বেশি থাকে। অল্প বয়স্ক স্বাস্থ্যবান গরু যখন নরম মাটি থেকে ঘাস খায় তখন মাটির নীচে থাকা এ রোগের জীবানু ঘাসের সাথে পশুর পেটে চলে আসে এবং রোগের সৃষ্টি করে।

লক্ষণ

শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে (১০৫-১০৭) ডিগ্রি পর্যন্ত হয়ে যায়। আক্রান্ত স্থান ফুলে যায়, মাংস কাল রং ধারণ করে এবং ফোলা স্থানে চাপ দিলে পচ পচ শব্দ করে। আস্তে আস্তে পশু দুর্বল হয়ে মারা যায়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

১। এ রোগের জীবানু বাতাসের সংস্পর্শে এলে বাঁচতে পারে না। সে জন্য আক্রান্ত ফোলা স্থানটি কেটে দিয়ে গ্যাস বের করে দিতে হবে।

২। প্রতিরোধের জন্য বাছুরের ৬ মাস বয়স থেকে প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর টিকা প্রয়োগ করতে হবে।

৩। আক্রান্ত পশুকে রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

চিত্রঃ বাদলা রোগাক্রান্ত গরু

পেট ফাঁপা (Bloat / Tymhpany)

গরুর হজমের ব্যাঘাতজনিত রোগ। রোমন্থক পশুর পেটে অতিরিক্ত গ্যাস জমে পেট ফাঁপা বা টিমপ্যানি রোগ সৃষ্টি হয় ।এর কারণে সৃষ্ট বদহজম রোগকে পেট ফাঁপা জনিত অর্জীর্ণতা রোগ বলে। সাধারণত পেটে শুধু মুক্ত গ্যাস জমা হলে তাকে টিমপ্যানি এবং ফেনাযুক্ত গ্যাস বুদবুদ আকারে পেটে জমা হলে তাকে ব্লোট বলে।

লক্ষণ

- হঠাৎ করে পশুর বাম পেট ফুলে যায় এবং আঙ্গুল দিয়ে আঘাত করলে ঠপ ঠপ শব্দ শুনা যাবে।
- আক্রান্ত পশু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।
- জাবর কাটা বন্ধ করে মাড়ি আটকে থাকে।
- পশুর শ্বাসকষ্ট হয়, বেশি শ্বাস কষ্ট হলে শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায়।
- প্রস্রাব পায়াখানা বন্ধ করে দেয়।
- শরীরের তাপমাএা স্বাভাবিক থাকে।

কারণ

অতিরিক্ত লিগুমিনাস ঘাস (যেমন বারসীম, মটর, খেসারী প্রভৃতি) সবুজ সরস ঘাস কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাদ্য খেলে ব্লোট রোগ সৃষ্টি হয়। চারণভূমিতে অধিক ইউরিয়া সার প্রয়োগ, খাদ্যে অতিরিক্ত মাএায় ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও নাইট্রোজেন প্রদান করলে এ রোগ সৃষ্টি হয়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

- ➢ পশুকে পঁচা, বাসি,ছত্রাকপড়া খাদ্য না খাইয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
- ➢ অধিক পরিমানে অথবা স্যাঁতেসেঁতে ঘাস না খাওয়ানোর মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
- ➢ আঁদা বেটে খাওয়ানো যাবে।
- ➢ আক্রান্ত পশুকে রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

চিত্র:পেট ফাঁপা রোগে আক্রান্ত গরু

গো-বসন্ত

কারণ

গো-বসন্ত ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট রোগ। গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া এই রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগ সাধারণত মহামারী আকারে দেখা দেয়।

লক্ষণ

অতিরিক্ত জ্বর হয় (১০৪-১০৫° ফাঃ), গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়, চোখ লাল হয়, জাবর কাটা বন্ধ করে, পিপাসা বেড়ে যায়। চোখ ও নাক দিয়ে আঠাল পদার্থ পড়তে থাকে। ঠোট ও গালের ভিতর, দাঁতের মাড়িতে ও জিহবার নীচে ছোট ছোট ফুসকুড়ি দেখা যায়। ক্রমেই এগুলো বড় হয়ে পরিণত হয় এবং মুখ দিয়ে লালা ঝড়তে থাকে। দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা, পায়খানায় আম, রক্ত এবং পঁচা অংশ মিশ্রিত থাকে। এ অবস্থায় জ্বর আস্তে আস্তে কমে যায় এবং ২-৪ দিনের মধ্যেই পশু খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মারা যায়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

১। রোগের উপর্যুক্ত কোন চিকিৎসা নেই তবে লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। সময় মত টিকা দিলে এই রোগ হয় না।

২। ক্ষত স্থান ০.১% পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট দ্রবন বা অন্য যে কোন জীবানুনাশক দ্বারা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

৩। আক্রান্ত পশুকে রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

চিত্রঃ গো-বসন্ত রোগে আক্রান্ত গরু

গবাদি পশুর রোগ প্রতিরোধে টিকার ব্যবহার

টিকাবীজ হচ্ছে রোগের প্রতিষেধক, যা রোগের জীবাণু বা জীবাণুর অ্যান্টিজেনিক (Antigenic) উপকরণ দ্বারা তৈরি করা হয়। প্রাণীর দেহের ভিতর রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য টিকাবীজ প্রয়োগ করতে হয়। কৃত্রিম উপায়ে কোন রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ঐ রোগের জীবানু দ্বারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে প্রতিষেধক তৈরি করা হয় তাহাই টিকা। টিকাবীজ প্রয়োগের ফলে দেহের ভিতর রক্ত বা রক্তরসে এক প্রকার ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Immunoglobulin) নামক আমিষ জাতীয় পদার্থ তৈরি হয়, যাকে অ্যান্টিবডি (Antibody) বলে। এ অ্যান্টিবডিই হচ্ছে রোগ প্রতিরোধক পদার্থ। যে রোগের জীবাণু দিয়ে টিকাবীজ তৈরি করা হয় টিকাবীজ প্রয়োগের ফলে সে রোগের বিরুদ্ধেই দেহের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে।

টিকাসমূহকে উহার কার্যকরী ক্ষমতা ও প্রস্তুত প্রণালীর উপর ভিত্তি করে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথাঃ-

- জীবন্ত টিকা (Live Attenuated Vaccine)ঃ যা জীবন্ত রোগজীবানু থেকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন তা রোগ সৃষ্টি করতে অক্ষম হয় উপরন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সৃষ্টি করে।
- মৃত জীবানু থেকে প্রস্তুত টিকা (Killed Vaccine) ঃ মৃত জীবানু থেকে প্রস্তুত এ টিকাও রোগ প্রতিরোধে সক্ষম, তবে দীর্ঘস্থায়ী নয়।

গরুর টিকা প্রদান কর্মসূচি

টিকার নাম	টিকার প্রকার	মাত্রা ও প্রয়োগবিধি	বয়স	সংরক্ষণ (তাপমাত্রা)
তড়কা	জীবন্ত টিকা	গরু ও মহিষ ১ মিলি এবং মেষ ও ছাগল ০.৫ মিলি করে চামড়ার নিচে; প্রতি বছর ১ বার	৪ মাস বয়সে	৪০° থেকে ৮০° সেন্টিগ্রেড
বাদলা	মৃত টিকা	বাছুর ৫ মিলি ও ভেড়া ২ মিলি করে চামড়ার নিচে; প্রতি বছর ২ বার	৪ মাস বয়সে	৪০° থেকে ৮০° সেন্টিগ্রেড
গলাফুলা	নিস্ক্রিয়	গরু ও মহিষ ১ মিলি মিলি করে চামড়ার নিচে; প্রতি বছর ২ বার	৬ মাস বয়সে	৪০° থেকে ৮০° সেন্টিগ্রেড
ক্ষুরা রোগ	ইনঅ্যাক্টিভেটেড টিকা	মনোভ্যালেন্ট-৩মিলি; ডাইভ্যালেন্ট-৬মিলি; ট্রাইভ্যালেন্ট-৯মিলি করে গলার চামড়ার নিচে ৪-৬ মাস পর পর ব্যবহার করতে হয়	৪ মাস বয়সে	২০° থেকে ৪০° সেন্টিগ্রেড
জলাতঙ্ক	জীবন্ত টিকা	৩ মিলি করে মাংস পেশিতে; ১মবার দেবার ১মাস পর বোস্টার ডোজ দিতে হয়; এরপর প্রতি বছর ১ বার	৩ মাসের উর্দ্ধে	-২০°সেন্টিগ্রেড

টিকা প্রদানের সময় সতর্কতা

- প্রতিষেধক টিকা সর্বদাই সুস্থ প্রাণীকে প্রয়োগ করতে হবে। সংক্রামক রোগ ও কৃমিতে আক্রান্ত প্রাণীকে দেয়া উচিত নয়।
- অসুস্থ্য/খুব দুর্বল পশুকে টিকা দেয়া যাবে না।
- জীবাণুমুক্ত / স্টেরিলাইজড সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।
- সময় না হলে টিকা দেয়া যাবেনা। যেমন- পশুর বয়স ও মেয়াদ বিবেচ্য।
- রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া গর্ভবতী পশুকে টিকা দেয়া উচিত নয়।
- টিকাবীজ সূর্যালোকের সংস্পর্শে নেয়া যাবে না। টিকা দেয়ার পূর্বে এবং পরে টিকাবীজ ব্যবহারের পাত্র, নিডল, সিরিঞ্জ, ডাইলুয়ান্ট ইত্যাদি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। জীবাণুমুক্তকরণে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা ঠিক নয়।
- প্রতিষেধক সকাল বা সন্ধ্যায় প্রয়োগ করা উত্তম। ব্যবহারের উদ্দেশ্য গলানো টিকা বীজ ১ ঘন্টার মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

- টিকা পরিবহনের ক্ষেত্রে কুলচেইন বা ঠান্ডা বস্তা নিশ্চিত করতে হবে। লাইভ ভ্যাকসিন ব্যবহারের সময় নিচে কাগজ বিছিয়ে নেয়া উচিত। কাগজের উপর ভ্যাকসিনের ড্রপ পরার পর টিকা প্রদান শেষে কাগজ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- মেয়াদ উর্ত্তীণ টিকা দেয়া যাবে না।

ভ্যাকসিন বা টিকা প্রদানের ফলাফল

- মারাত্নক সংক্রামক ও ক্ষতিকারক রোগের আক্রমণ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করা যায়।
- নির্দিষ্ট এলাকা / স্থানে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
- গবাদিপশু রোগাক্রান্ত হলে যে অর্থ ব্যয় হয়, যথা সময়ে এবং যথা নিয়মে ভ্যাকসিন দিয়ে রোগ প্রতিরোধ করার মাধ্যমে তা সাশ্রয় করা যায়।

আমাদের দেশে ভ্যাকসিন / টিকা অকার্যকর হওয়ার কারণ

- টিকা প্রয়োগের সময় বাচ্চার শরীরে মায়ের কাছ থেকে পাওয়া এন্টিবডির পরিমাণ বেশী থাকলে।
- পূর্ব থেকেই যদি গবাদিপশু রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে বা অন্য রোগে আক্রান্ত থাকলে।
- ভ্যাকসিন সংরক্ষণে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ না করলে লাইভ ভ্যাকসিনের জীবাণু মারা যাবে ফলে ভ্যাকসিন কার্যকর হবে না।
- নির্ধারিত মাত্রায় ভ্যাকসিন প্রয়োগ না করা।
- যথাসময়ে মিশ্রিত ভ্যাকসিন ব্যবহার না করা (সাধারনত ভ্যাকসিন মিশ্রণের পর ১ ঘন্টার মধ্যে)।
- আবহাওয়াজনিত যেকোন ধরণের ধকল। যেমন - অতিরিক্ত গরম।
- ভ্যাকসিন করার যন্ত্রপাতি পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত না করা।
- ভ্যাকসিনে সরাসরি সূর্যের কিরণ লাগা।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টিকা মিশ্রণ এবং প্রয়োগ নিশ্চিত না করা হলে।
- উপযুক্ত বয়সে, সঠিকভাবে এবং পরিমাণমত টিকা প্রয়োগ না করলে।
- পাউডার জাতীয় টীকা ডাইলুয়ান্ট এ না মিশিয়ে গভীর নলকূপের পানিতে মিশালে।

এক নজরে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রক্রিয়া

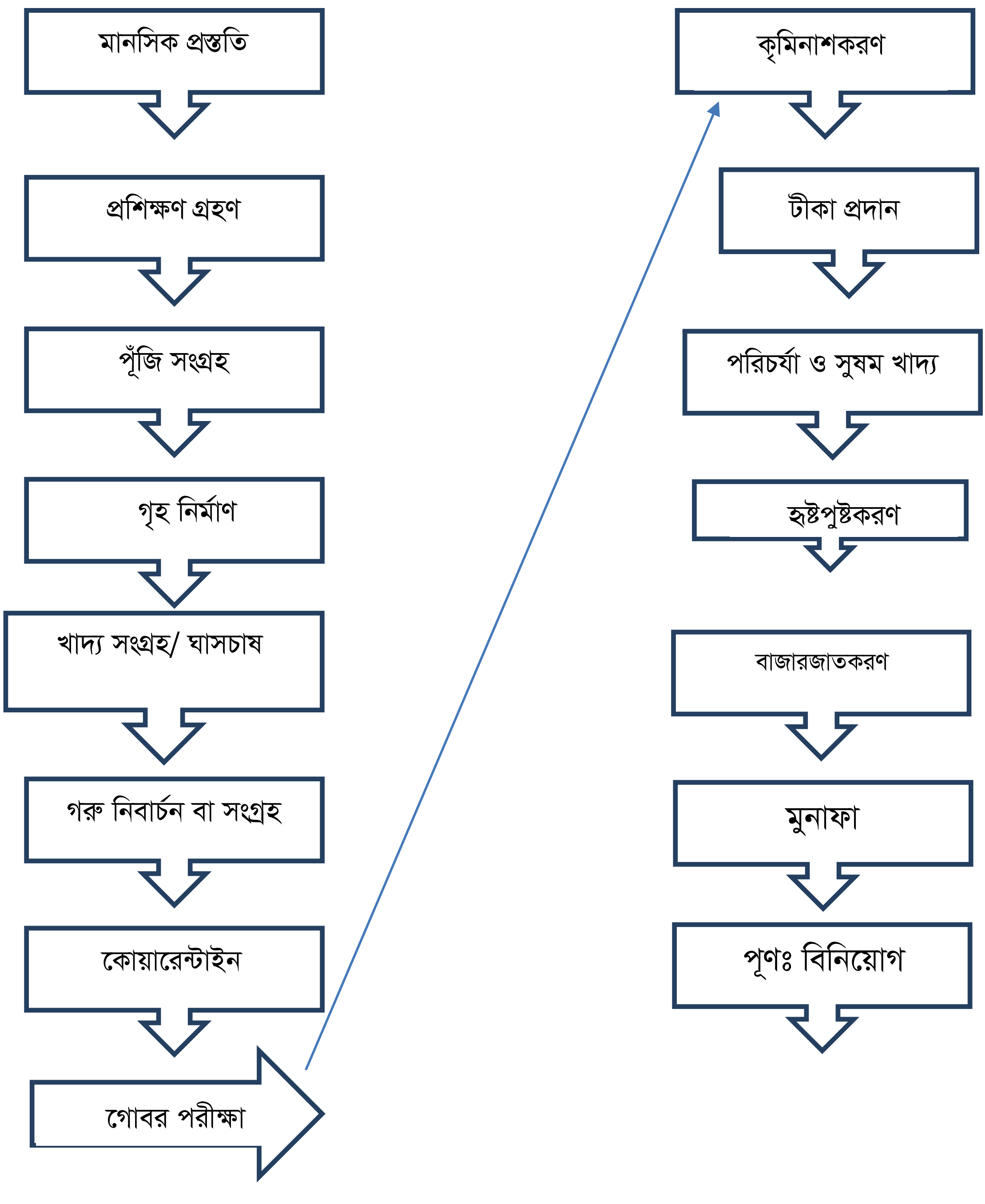

গরুর ওজন নির্ণয়

নির্দিষ্ট সময় পর পর গরুর ওজন নির্ণয় করে মাংস বৃদ্ধির হার পরীক্ষা করতে হবে এবং উহার তথ্য নিবন্ধনকার্ডে সংরক্ষণ করতে হবে। গরুর খাদ্যের চাহিদা উহার দৈহিক ওজন ও পালনের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়। কিন্তু গরুকে দাড়িপালা বা স্কেলে তুলে পরিমাপ করা জটিল কাজ। তাই বিকল্প পদ্ধতিতে গরুর সামনের পায়ের সোল্ডারের জয়েন্ট থেকে বাটক এর পিন পয়েন্ট পর্যন্ত দৈর্ঘ্য এবং সিনার কাছে দিয়ে বুকের পরিমাপ ইঞ্চিতে মেপে নিম্নে বর্ণিত সূত্রের মাধ্যমে গরুর ওজন কত কেজি হবে উহা পরিমাপ করা সম্ভব।

গরুর আনুমানিক ওজন নির্ণয় সূত্র ঃ

$$\text{গরুর ওজন} = \frac{\text{লম্বা (ইঞ্চি)} X \text{ (বুকের বেড়} X \text{ বুকের বেড়)(ইঞ্চি)}}{\text{৩০০ x ২.২}} \text{ (কেজি)}$$

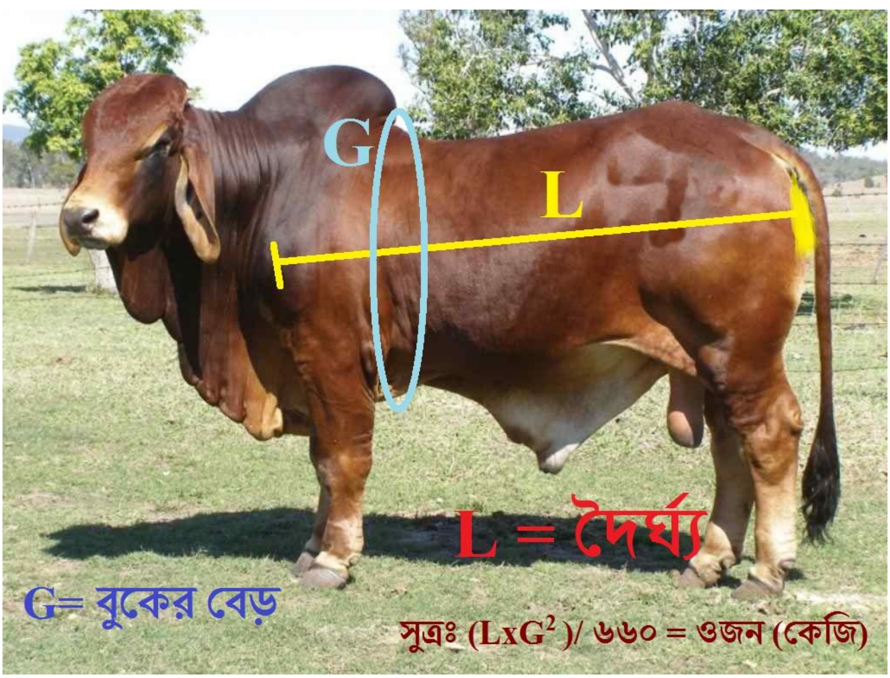

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য (১০টি গরুর) বিভিন্ন ব্যয়, আয় ও নীট মুনাফা সংক্রান্ত খসড়া হিসাব বিবরণী

ক্র.নং	আইটেম	টাকার অংক
১.	স্থায়ী বিনিয়োগ	
	জমি	নিজস্ব
	গোয়াল ঘর	৫০,০০০.০০
	গোয়াল ঘরের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি	২০,০০০.০০
	অন্যান্য	৫,০০০.০০
	উপমোট	৭৫,০০০.০০
২.	উৎপাদন ব্যয় বিনিয়োগ (আবর্তক খরচ)	
	গরুর ক্রয় মূল্য ৩০,০০০.০০ হিসেবে ১০টি গরুর মূল্য	৩,০০,০০০.০০
	খাদ্য খরচ; গরু প্রতি দৈনিক ৫০.০০ টাকা হারে ১২০ দিন	৬০,০০০.০০
	ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা	১০,০০০.০০
	অন্যান্য খরচ	৩,০০০.০০
	উপমোট	৪,৪৮,০০০.০০
৩.	বার্ষিক উৎপাদন ব্যয় বিনিয়োগ(বছরে তিনটি ব্যাচে গরু হৃষ্টপুষ্ট করা সম্ভব ধরে)	১১,৯৪০০০.০০
৪.	কার্যকরী মূলধন (মোট বিনিয়োগ)	৫,০০,০০০.০০
৫.	সংগৃহিত মূলধনের উপর বাৎসরিক সুদ ৫.০%	২৫,০০০.০০
৬.	রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	২৫,০০০.০০
৭.	মোট বাৎসরিক ব্যয়	১২,৪৪,০০০.০০
৮.	বিভিন্ন খাত থেকে আয়	
	গরু বিক্রয় বাবদ আয় ৬০,০০০.০০ প্রতিটি **(বছরে ৩০টি)**	১৮,০০০০০.০০
	গোবর বিক্রয় বাবদ আয়	৯,০০০.০০
	বাৎসরিক মোট আয়	১৮,০৯,০০০.০০
৯.	বাৎসরিক মুনাফা	৫,৬৫,০০০.০০
১০.	বাৎসরিক শ্রমমূল্য ৫০০.০০ প্রতিদিন (খামারী নিজে শ্রম দিলে ব্যয় নিষ্প্রয়োজন)	১,৮২,৫০০.০০
১১.	নীট বাৎসরিক মুনাফা	৩,৮২,৫০০.০০

<u>প্রাণিস্বাস্থ্য কার্ড</u>

খামারীর নাম ঃ..খামারীর পিতার/স্বামীনামঃ......................................

প্রাণীর জাত ঃ.............................. লিঙ্গঃ.............................বয়সঃ..

প্রানীর সংখ্যা ও পরিচিতি নম্বর ঃ................................গ্রামঃ.......................ইউনিয়নঃ...............

উপজেলা ঃ......................জেলা ঃ....................মোবাইল নম্বর ঃ ....

(ক) টিকা প্রয়োগের তথ্যাদি ঃ

টিকার নাম	প্রয়োগের তারিখ	সময়	মাত্রা	প্রয়োগের স্থান / পথ	মন্তব্য / স্বাক্ষর
ক্ষুরা রোগ					
তড়কা					
বাদলা					
গলাফুলা					
অন্যান্য					

(খ) কৃমিনাশক গ্রহন ও প্রদানের তথ্যাদি ঃ

প্রকল্প থেকে গ্রহণের তারিখ	কৃমিনাশকের নাম	প্রাপ্ত কৃমিনাশকের মোট পরিমান	১ম মাত্রা খাওয়ানোর তারিখ	২য় মাত্রা খাওয়ানোর তারিখ	মন্তব্য / স্বাক্ষর

(গ) ভিটামিন এবং মিনেরাল প্রিমিক্স গ্রহন ও প্রয়োগের তথ্যাদি ঃ

১. প্রকল্প থেকে গ্রহণের তথ্যাদি ঃ

প্রকল্প থেকে গ্রহণের তারিখ	প্রাপ্ত প্রিমিক্সের নাম	প্রাপ্ত প্রিমিক্সের মোট পরিমান	মন্তব্য / স্বাক্ষর

২. খামারী কর্তৃক প্রিমিক্স ব্যবহারের তথ্যাদি ঃ

মাস ও তারিখ	ভিটামিন প্রিমিক্সের নাম	প্রতিদিন ব্যবহারের পরিমান	মাসিক ব্যবহারের পরিমান	মোট পরিমান	মন্তব্য / স্বাক্ষর

(ঙ) চিকিৎসা / পরামর্শ প্রদানের তথ্যাদি ঃ

প্রাণীর পরিচিতি নম্বর	সমস্যা/ রোগের নাম	প্রদত্ত ঔষধের নাম ও মাত্রা	চিকিৎসা প্রদানের তারিখ	মন্তব্য / স্বাক্ষর

(চ) হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য নির্বাচিত গরুর ওজন নির্ণয়ের তথ্যাদি ঃ

প্রাণীর পরিচিতি নম্বর	কার্যক্রম শুরুর পূর্বে নির্ণীত ওজন	১৫ দিন পর নির্ণীত ওজন	৩০ দিন পর নির্ণীত ওজন	৪৫ দিন পর নির্ণীত ওজন	৬০ দিন পর নির্ণীত ওজন	৭৫ দিন পর নির্ণীত ওজন	৯০ দিন পর নির্ণীত ওজন	১০৫ দিন পর নির্ণীত ওজন	১২০ দিন পর নির্ণীত ওজন	মন্তব্য / স্বাক্ষর

গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য নিকটস্থ
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ করুন।